কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

আগষ্ট ১৯৮৮

প্রচ্ছদ নিবন্ধ ঃ সাপ ও সাপের বিষ

রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক নির্বাচিত
গ্রন্থতালিকা—৮০-৮১-৮২, ৮৩-৮৪

অন্নদাশঙ্কর রায়	লালন ও তাঁর গান	১০·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	বনে জঙ্গলে	১৫·০০
সমরজিৎ কর	কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান	২১·০০
অন্নদাশঙ্কর রায়	হট্টমালার দেশে	৮·০০
গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য	পশু পাখী কীটপতঙ্গ	১০·০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য	রোবোট এল কেমন করে	৮·০০
সুনির্মল বসু	রোমাঞ্চের দেশে	৬·০০
সমরজিৎ কর	নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী	২০·০০
প্রবোধবন্ধু অধিকারী	চিৎপুর চরিত্র	২৫·০০
শীতাংশু মৈত্র	যুগন্ধর মধুসূদন	১৫·০০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	তেপান্তর	২০·০০
অমরনাথ রায়	জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা	১০·০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ছোঃ সন্দীপন পাঠশালা	১০·০০
অমরনাথ রায়	সংখ্যা নিয়ে খেলা	৮·০০
আর্থার কোনান ডয়েল	কিশোর গোয়েন্দা গল্প	১০·০০
আর্থার কোনান ডয়েল	কিশোর রহস্য গল্প	৮·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র	ঘনাদা বিচিত্রা	২০·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	অপুর ছেলেবেলা	১০·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কিশোর অপু	২০·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ছোটদের অপরাজিত	১০·০০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ছোটদের কাশীনাথ	১০·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	পশুপক্ষী	২০·০০
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	বাঙলার ডাকাত (১-৪)	৩২·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	খুকুমণির ছড়া	১০·০০

সাহিত্য সংগ্রহ ও বিবিধ প্রবন্ধ

অন্নদাশঙ্কর রায়
স্বাধীনতার পূর্বাভাস ১৫

প্রবোধবন্ধু অধিকারী
চিৎপুর চরিত্র ২৫

অনন্ত সিংহ
কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত ২০

মণি বাগচি
সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ ১৬

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
মুনশী রামরাম বসু ২০

শীতাংশু মৈত্র
যুগন্ধর মধুসূদন ১৫

রমাপদ চৌধুরী
আমরা সবাই ১০

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
পুরাতন গদ্যগ্রন্থ সঙ্কলন ১ম ও২য় খণ্ড ৩৫

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
বিনোদ বিনোদিনী ২০

বিপিনবিহারী গুপ্ত
রবীন্দ্র সঙ্গ প্রসঙ্গ ৩০

শ্রীম কথিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২৫

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
উপন্যাস মানুষেরসত্যাসত্য ৩০

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়
থমকে কেন দাঁড়িয়ে ১০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
কখনো সম্রাজ্ঞী ৮

অমিত রায়
দুই রমনীরগপ্পো১০

সুকুমার ভট্টাচার্য
সবাই মিলে ৬

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

ছাব, ছড়া ও গল্পের বই

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
খেলার সাথী ৬·০০

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
কথামালার গল্প ৪·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার কুট্টিমামা ৫·০০

ধীরেন বল
ঠেকে হাবুল শেখে ৫·০০

দেবাশীষ বল
বাঘ সাপ হাতি ৬·০০

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
মনোহর ডাকাত ৬·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
কচিমুখের ছড়া ৫·০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
ঠাকুমার ঝুলি ৮·০০
ঠাকুরদাদার ঝোলা ১০·০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
ছোটদের রামায়ণ ১০·০০
ছোটদের মহাভারত ১০·০০

মনি বাগচি
অমর চরিত কথা ৭·০০

অখিল নিয়োগী
ছবিতে সাধারণ জ্ঞান ১০·০০

তপনায়ন ঘোষ
ডেড্ লাইন ৩১ অক্টোবর ১০·০০

হাননান আহসান
স্পোর্টস ক্যুইজ ৮·০০
রঞ্জন'স ক্লাসিক্যু কমিক্স
অগ্নিগিরির গুপ্তধন ৩·০০
শেষ বিজয় ৩·০০
কলঙ্কিত ছোরা ৩·০০
মুক্তিযোদ্ধা ৩·০০
মৃত্যু মাতাল অরণ্য ৩·০০
সাগর শয়তান ৩·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

অষ্টম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা
আগস্ট : 1988

সূচীপত্র

চিঠিপত্র : 4

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর : নক্ষত্র রহস্য ॥ সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প : গ্রহকণ্ঠ ॥ পরিচয় গুপ্ত 35
রসের রসিক ॥ মিঠু মাইতি 47

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : সাপ ও সাপের বিষ ॥ ননীগোপাল মণ্ডল 19
গোসাপ ॥ যদুপতি মল্লিক 21 : সাপের বিষ ॥ বিমান ঘটক 22

পড়াশোনা : ম্যাগনেসিয়াম ॥ অমরনাথ রায় 18 : স্থিতিস্থাপকতা কি ও কেন ॥ সমীর কুমার ঘোষ 51

জীবজন্তু : গণ্ডারের গল্প ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 40

জানা-অজানা : অনুপম বড়াল ॥ সৌরভ দে 42

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিবিধ রচনা : ইলেক্ট্রনিকস্ ক্যুইজ ॥ বিপ্লব ব্যানার্জী 39 : বিজ্ঞানের খবর ॥ যুধাজিৎ দাশগুপ্ত 9 : পাথর কেটে বই ॥ কার্তিক ঘোষ 62 : দ্বীপের জন্ম ও মৃত্যু ॥ অনিশা দত্ত 29

কমপিউটারের কলাকৌশল : বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ॥ সৌম্য মিত্র 15

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : গুরু-শিষ্য ॥ কল্যাণ মৈত্র 53

গাছপালা : বনসৃজনে ইউক্যালিপটাস ॥ ছন্দোময় মণ্ডল 27

ধারাবাহিক রচনা : নীল সাগরে রহস্য ॥ দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 31

খেলাধুলা : খেলাধুলার টুকিটাকি ॥ অজয় দাশগুপ্ত 49

ফিচার ও ছবিতে গল্প : খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 : যুগের ভিতর যুগ ॥ গৌতম কর্মকার 43 : প্রাণী বিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী : বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 14 : বিচিত্র ঘরবাড়ী ॥ কিন্নর রায় 55 : জীবজন্তু ॥ অজয় হোম 56 : ক্যুইজ কনটেস্ট 57 : সমাধান 58

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ : সফল উত্তরদাতাদের নাম 63 : লাল কালি-নীলকালি ॥ অপরাজিত বসু 65 : বিজ্ঞান সংবাদ 66 : বলতে পারো কেন ? ॥ সুধাংশু পাত্র 59 : ইলেকট্রনিক প্ল্যান্ট স্টোর ॥ অভিজিৎ সাহা 61 : শব্দকূট ॥ পুলিন বিহারী সাউ 58

প্রচ্ছদ : অলয় ঘোষাল ॥ **অন্যান্য ছবি :** অলয় ঘোষাল ও সুবোধ মণ্ডল

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ইলেকট্রোপ্লেটিং : যার আরেক নাম ইলেকট্রোলিসিস

লিখেছেন

দীপাঞ্জন মিত্র

প্রধান সম্পাদক : **সমরজিৎ কর**
সম্পাদক : **রবীন বল**
সহ সম্পাদক : **জয়ন্ত দত্ত**

চিঠিপত্র

অঙ্ক কষায় ভুল

জুন '৪৪এ প্রকাশিত জয়ন্ত ঘোষদস্তিদার রচিত মজার অঙ্ক রচনাটির কিছু ভুল সংশোধিত হওয়া দরকার। তাঁর প্রমাণের বিষয়বস্তু হল এই যে—

$a^0 = b^0 = 1, \quad \therefore a = b,$

কিন্তু যে কোনো সংখ্যার-ই (Power) ঘাত 0 হলে সংখ্যাটির মান হয় 1.

$\therefore a^0 = b^0 = 1$ হলে $a = b$ } হতে পারে
বা $a \neq b$ } হতে পারে

$\therefore a \neq b$ হলে $a^0 = b^0$ হবে।

$\therefore 11^0 = 703^0$ বটে কিন্তু $11 \neq 703$,

যদি তিনি প্রমাণ করতেন যে $11^1 = 703^1$ তখন $(a^1 = b^1)$ তখন $(a = b)$ বা $11 = 730$ প্রমাণিত হত।

$11^0 = 703^0$, হয় $11 = 703$ } এই দুই প্রকার হতে পারে।
অথবা $11 \neq 700$ }

$\therefore$ আমরা জানি কোনো সংখ্যার সহিত (ওই সংখ্যা ব্যতীত) অন্য কোনো সংখ্যা সমান নয়।

$\therefore 11 \neq 703$।

অতিরিক্ত সংযোজন :

অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ দৃষ্টিতে অনেক গাণিতিক প্রমাণে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভুল থাকে।

1) $1 = 1$,
$a = a$, [উভয়পক্ষে a গুণ করে]
$a^2 = a^2$ [উভয় পক্ষে বর্গ করে],
$a^2 - a^2 = a^2 - a^2$ [উভয় পক্ষে $-a^2$ যোগ করে]
$a(a \quad a) = (a+a)(a-a)$
$a^2 - a^2 = (a+a)(a-a)$ কারণ
$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$.
উভয়পক্ষ থেকে $(a-a)$ বর্জিত করে
$a(a-a) = (a+a)(a-a)$
$a = 2a$ $1 = 2$, $1 = 4$, $3 = 0$, ইত্যাদি

(2) $a = 3$, $b = 1$, $x = 0$,
$ax = bx$, $\frac{a}{b} = \frac{x}{x} = 1$, $\frac{3}{1} = 1$, $3 = 1$, $2 = 0$, $4 = 0$ ইত্যাদি

(3) $a^2 - 2ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$
$a^2 - 2ab + b^2 = b^2 - 2ab + a^2$.
$(a-b)^2 = (b-a)^2$.
$a - b = b - a$ [উভয়পক্ষকে বর্গমূল করে পাই]

আবিষ্কারক কে ?

June '৪৪ সংখ্যায় 'থার্মোমিটার কে আবিষ্কার করিছিলেন' লেখাটি পড়লাম। এতে গ্যালিলিও এক ধরণের থার্মোমিটার আবিষ্কার করেন এটি বলা আছে, আর আছে থার্মোমিটারের কলাকৌশল। আধুনিক থার্মোমিটারের আবিষ্কর্তার নাম এতে নাই। প্রসঙ্গত বলে রাখি আধুনিক থার্মোমিটারের আবিষ্কর্তা হলেন 'গ্যাব্রিয়েল ফারেন হাউট' (1714) : তার নাম অনুসারে ফারেন হাইট স্কেল। আর বহু প্রচলিত সেলসিয়াস স্কেলের প্রবক্তা হলেন সুইডিস বিজ্ঞানী আন্দ্রে সেলসিয়াস। **সৌমেন রায়**, মেদিনীপুর

আবিষ্কারের গল্প

আমি 'কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। বিজ্ঞান ভিত্তিক এই উন্নত মানের পত্রিকাটিকে আমি খুব আগ্রহ সহকারে খুঁটিয়ে পড়ি। আমার খুব ভাল লাগে এই পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা। অপেক্ষা করে থাকি প্রতিমাসের ক্রম উন্নততর এই পত্রিকা প্রতিটি সংখ্যা শীঘ্রই হাতে পাবার আশায়।

যাইহোক, এই পত্রিকার অন্যান্য বিভাগের মত 'আবিষ্কারের গল্প' বিভাগটি মনোযোগ সহকারে পড়ি। কিন্তু প্রতিমাসেই দেখি লেখক যে বস্তু বা যন্ত্র নিয়ে লেখেন, তার আসল আবিষ্কারকের নাম এড়িয়ে যান। বা ভুল করেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যেতে পারে, 'জুন' ৪৪' সংখ্যায় লেখক ক্যামেরার বিবরণ দিয়ে গেছেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে এই যন্ত্র আবিষ্কার করেন তার নাম এড়িয়ে গেছেন। 1888 খ্রীস্টাব্দে ইষ্টম্যান কোডাক ক্যামেরা আবিষ্কার করেন। আমার মতে বিভাগটির নাম "বিভিন্ন যন্ত্রের বিবরণ" হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

অয়ন গোস্বামী, সাদিখাঁরদেয়াড়

$2a = 2b,$

$a = b,$

কিন্তু উপরোক্ত প্রমাণগুলিতে কিছু না কিছু ভুল আছে।

(1) $a(a-a) = (a+a)(a-a)$. Step-5

$a \times o = (a+a) \times o.$

$\frac{a}{o} = \frac{a+a}{o}. \quad \frac{a}{o} = \frac{2a}{o}$

$\frac{a}{o} \neq o, \quad \frac{2a}{o} \neq o, \quad \frac{a}{o}$ infinitive.

$\frac{2a}{o} \rightarrow$ imaginary.

উভয় ক্ষেত্রেই হরে o রয়েছে $\frac{a}{o}$ এর অসীম মান $\frac{2a}{o}$ এর অসীম মানের দ্বিগুণ অর্থাৎ উহারা অসমান।

উক্ত ক্ষেত্রে হরের O কে বাদ দিয়ে প্রমাণটি করা হয়েছে। যদিও আমরা জানি Equation Solve এর ক্ষেত্রে হয়ে O যুক্ত থাকলে (কোনো ভগ্নাংশের) উভয় পক্ষ থেকে উহাকে বর্জিত করা যায় না।

Example→ $\frac{m}{o} = \frac{a}{o}$ হলে $m \neq a, \quad \left\{\begin{matrix} a \neq 2a \\ 1 \neq 2, \end{matrix}\right\}$

(2) দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও প্রথমটির ন্যায় ভুল করা হয়েছে।

$cx = bx$ বটে

$\frac{a}{x} = \frac{b}{x}, \quad \therefore \quad \frac{3}{0} = \frac{1}{0}, \qquad 3 \times \frac{1}{0} = \frac{1}{0},$

এবং O কে বর্জিত করে $a = b$ প্রমাণ করা হয়েছে $\therefore$ সেটি অসত্য।

$\therefore$ স্পষ্টতঃ প্রথম পক্ষ $\neq$ দ্বিতীয় পক্ষ।

(3) $(a-b)^2 = (b-a)^2$ বটে

কিন্তু গণিতের ↓ ক্ষেত্রে $\left\{\begin{matrix} a^2 = b^2 \text{ হলে} \\ a = b \text{ বা } a \neq b \\ \text{উভয়ই হতে পারে} \end{matrix}\right.$

or $\{ + (a-b) \}^2 = \{ - (a-b) \}^2$

or $+ (a-b) = -(a-b),$

or $+1 = -1,$

কিন্তু ইহা সত্য নয়।

যদি-ও $(+1)^2 = (-1)^2$

$\therefore$ প্রমাণে অবশ্যই ভুল আছে এবং আমরা জানি স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে যে কোন সংখ্যা ওই সংখ্যার সহিত সমান। অনুরূপে অন্য কোনো সংখ্যার সহিত অসমান।

$\therefore \quad a \neq b, \; b \neq c, \; 1 = 2, \; 4 \neq 5, \; 11 \neq 703.$

[সাধারণতঃ]

দেবকুমার বসু, 12 /B যোগীপাড়া লেন, কল-6

বলতে পারো কেন ?

আমি 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার একজন নিয়মিয়ত পাঠক, এর 'বলতে পার কেন' ? নামক বিভাগটি আমার খুব প্রিয়। এই বছরের May মাসের সংখ্যায় এই বিভাগে লক্ষীকান্ত বসু মহাশয়ের প্রশ্ন ডিনামাইট কি ? এবং কে আবিস্কার করেন ?—এর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ—

তরল বিস্ফোরক পদার্থ—সেগুলি অতি সামান্য কারণে বিস্ফোরণ ঘটায়, সেগুলিকে নিরাপদে ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাহাই ডিনামাইট।

কিন্তু এটি একটি বিজ্ঞান পত্রিকা। তাই আমার মতে এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হত ঃ

Glyceryl trinitrate বা nitroglycerine সালফিউরিক এসিড্, ও নাইট্রিক এসিড্ আর glycerol এর মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরী হয় একটি তরল তৈলাক্ত পদার্থ যা অতি সামান্য ঠোকাতেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে nitroglycerine নিয়ে কোন কাজ করা খুব মুশকিল। আলফ্রেড নোবেল এই nitrogiycerine কে কাঠগুঁড়ো আর Sodium nitrate এর মধ্যে শোষন করিয়ে এক ধরনের বোমা তৈরী করেন যার নাম ডিনামাইট্।

—তাহলে এর উত্তর আরো সুন্দর ও সম্পূর্ণ হত।

এই বছরের May মাসের সংখ্যায় রাজেশ গিরির লেখা পড়লাম। এতে তিনি লিখেছেন যে 'Mfd'-এর বেশী মানের কণ্ডেনসারগুলো হল ইলেকটো-লাইটিক্, কথাটা কি ঠিক? তাহলে বাড়ির সিলিং ফ্যান গুলোতে '2 mfd'-এর যে কণ্ডেনসারগুলো লাগানো আছে, তাকি ইলেকট্রোলাইটিক্ কণ্ডেনসার? Ac সার্কিটে যে কণ্ডেনসারগুলো লাগানো আছে, তা কি কণ্ডেনসার?

অনুপম ভৌমিক দুর্গাপুর-5

মডেল নির্মাতার প্রতি

"কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের" আমি একজন নিয়মিত পাঠক। এইবার জুন মাসের সংখ্যায় নিজে নিজে কর বিভাগে water heater দেওয়া হয়েছে। আমি এটি তৈরি করে যখন ভাল করে গরম করলাম তখন সাদা ফেনা হচ্ছিল। কেন? সেটা কি চান করার সময় শরীরের পক্ষে ক্ষতি কারক?

দীপ্তিমান ব্যানার্জী, 6/14 সী, পী, টী হলদিয়া টাউনশিপ, মেদিনীপুর পঃ বঙ্গ-721507.

মডেল নির্মাণ

মার্চ 1988-র 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকার মৃণালকান্তি দাস-গুপ্তের "প্রাণের উত্তর" প্রচ্ছদ নিবন্ধতে তিনি লিখেছেন "আরিস্তত্তল ছিলেন ইউরোপের দর্শন বিজ্ঞানের গুরু" আমার মনে হয় ওটা আরিস্তত্তল না হয়ে 'অ্যারিষ্টটল' হবে। ঐ নিবন্ধের আরেক জায়গায় দেখতে পেলাম "অ্যামিনে অ্যাসিড" কথাটি। আমার আমার মনে হয় ওটা "অ্যামাইনো অ্যাসিড" হবে। ঐ কথাটি আবার নিত্যগোপাল বসুর "চিকিৎসা বিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ" রচনাতেও দেখলাম। অনেক বাবুর বইতে পড়ে আসছি অ্যামাইনো অ্যাসিড কথাটি। আবার রাজেশ গিরির "মডেল বানাতে গিয়ে লেখাটিতে ট্রানজিস্টারের বেস সম্বন্ধে যে কথাটি বলেছেন সেকথাটা ঠিক পরিস্কার হয়নি। আবার তিনি যে কথা বলেছেন তা সব ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় Ac ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে যে পিনটি মাঝখানে অর্থাৎ যে দুটি পিন সমান্তরাল এবং অপেক্ষাকৃত দূরত্ব বেশি তাদের থেকে পিছনে এবং মধ্যে অবস্থিত পিনটিকে বেস বলে। আবার Dc ট্রানজিস্টারের PNP টাইপ টা যেগুলো সেগুলোর পিনগুলো উপর দিকে ধরে সামনের দিকে মুখ রাখলে বাঁদিকের টা বেস হয় এবং NPN টাইপকে একই ভাবে ধরলে মাঝেরটা বেস হয়।

দেবাশীষ সাধু প্রফুল্লনগর হাবড়া

বিবিধ প্রসঙ্গ

'আবিস্কারের গল্প' বিভাগটির নতুন নামকরণ করার প্রস্তাব রাখছি 'জিজ্ঞার গল্প'।

অনিরুদ্ধ সরকার মহাশয় লেখকের ভ্রমসংশোধন করতে গিয়ে নিজেই ভ্রমের কবলে পড়েছেন, তিনি ইলেকট্রন কণিকার (—) চার্জের কথা বলেছেন, কিন্তু বাকী ক্ষেত্রেই কোনো একক (unit) ব্যবহার কোন যুক্তিতে করেন নি, তিনিই জানেন।

লক্ষ্মী কান্ত বসু, গোবরা, চণ্ডি-তলা, হুগলী, 712702

গত June-'88 সংখ্যায় "বলতে পারো কেন?" বিভাগের 60 পৃষ্ঠায় "1300 আলোক বর্ষ দুরের কোন নক্ষত্রের..." কথাটা লেখা আছে, এ লেখাটি ভুল, এখানে 1300 কোটি আলোক বর্ষ হবে। এছাড়াও ঐ একই সংখ্যার পত্রিকার "পড়াশোনা" বিভাগে 15 পৃষ্ঠায় নিওন গ্যাসের আবিস্কারের তারিখ "7 জুন, 1988 আছে, এটি 7 জুন, 1898 হবে। আমার অনুরোধ এর পর যাতে এধরণের ভুল না হয়।

জগদীশ চক্রবর্তী, মেদিনীপুর

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর

অব্যক্ত

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ।। দাম ১৫·০০ টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮/৬১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

নক্ষত্র রহস্য

সমরজিৎ কর

বিশিষ্ট সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানী লেভ ল্যানডাউ তখন কোপেনহেগেনে গবেষণা করছেন, সেটা 1932। এমন সময় খবর এল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেখানকার আর এক বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী পরমাণুর মধ্যে বিশেষ এক ধরণের কণা আবিষ্কার করেছেন। এই কণার ভর প্রোটনেরই মত। পার্থক্য শুধু, প্রোটনে থাকে পজিটিভ বিদ্যুৎ আধান। নতুন আবিষ্কৃত এই কণায় বিদ্যুৎ আধান নেই। অর্থাৎ এক কথায় যাকে বলা চলে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কণা। কণাটির নাম দেওয়া হয় নিউট্রন। কোপেনহেগেনে নিজের গবেষণাগারে বসেই খবরটি পেলেন ল্যানডাউ। আর তার এক ঘণ্টার মধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎবাণী করে বসলেন তিনি। বললেন, ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় নক্ষত্র কোন না কোন সময় এমন একটি অবস্থায় গিয়ে পৌঁছবে, যখন তাদের মধ্যে থাকবে শুধু এক ধরণেরই কণা—ওই অবস্থায় ওই নক্ষত্রগুলিকে বলা হবে "নিউট্রন নক্ষত্র"। তাদের আয়তন হবে খুবই ছোট। অকল্পনীয় রকমের বেশি হবে তাদের ঘনত্ব।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আলোড়ন। কথাটা অন্য কেউ বললে না হয় উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু বক্তা যে স্বয়ং ল্যানডাউ। তাঁকে তো আর সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না? সবার মনে তখন দেখা দিল একটিই প্রশ্ন ঃ এক ঘন সেণ্টিমিটার জায়গার মধ্যে যত গ্রাম বস্তু থাকে সেটাই হল ঘনত্বের হিসেব। যখন আমরা বলি, জলের ঘনত্ব। গ্রাম/এক ঘন সেণ্টিমিটার, তার অর্থ দাঁড়ায়, এক ঘন সেণ্টিমিটার জায়গায় যতটা জল থাকে তার ওজন এক গ্রাম। যখন বলি, অমুক বস্তুর ঘনত্ব 5 তার অর্থ একঘন সেণ্টিমিটার আয়তনে ওই বস্তু যতটা থাকে, তার ওজন 5 গ্রাম। এখন ব্যাপার হল, একটি নক্ষত্র তো আর ছোট-খাটো বস্তু নয়! ল্যানডাউ যে ঘনত্বের কথা বলছেন, কোন নক্ষত্রকে যদি সেই ঘনত্বে নিয়ে আসতে হয় তা হলে তো দরকার অকল্পনীয় পরিমাণ শক্তি। এমন চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে নক্ষত্রটির আয়তন যাবে অস্বাভাবিক কমে। তখন এক ঘন সেণ্টিমিটার আয়তনে থাকবে প্রচুর পরিমাণ বস্তু। কী ভাবেই বা সেটা সম্ভব?

উত্তরটি পাওয়া গেল কয়েক মাসের মধ্যেই।

নিউট্রন নক্ষত্রের জন্ম

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ওয়ালটার বাদে এবং ফ্রিট্‌জ জুইকি। নক্ষত্রের বিস্ফোরণের উপর তাঁরা চালাচ্ছিলেন পর্যবেক্ষণ। বিস্ফোরণ চলছে অতিকায় যে নক্ষত্রে তাকে বলা হয় সুপারনোভা (supernovae)। শব্দটি অবশ্য বাদে এবং জুইকিরই তৈরি। তাঁরা জানালেন, অতিকায় নক্ষত্রে যখন শক্তিসরবরাহ কমে যায়, অথবা প্রায় শেষ হয়ে আসে, তখন তাতে ঘটে বিস্ফোরণ। সেই বিস্ফোরণের দরুণ তার বাইরের অংশের অনেকটা অংশ ছিটকে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। আর বিস্ফোরণের প্রচণ্ড চাপে তার ভেতরের অংশটি ভীষণ ভাবে হয় সংকুচিত। সংকোচনের পর তার ব্যাস এসে দাঁড়ায় কখনো কখনো 20 কিলোমিটারের মত। ওই অবস্থায় তার ভর হয় সূর্যের ভরের সমান। যেন একটি সূর্যের সমস্ত প্রচণ্ড চাপে সংকুচিত করা হয়েছে মাত্র 20 কিলোমিটার ব্যাসের একটি গোলকে। একটি আলপিনের মাথায় যেটুকু আয়তন,

এই নক্ষত্রের ততটা বস্তুর ওজন দাঁড়ায় তখন দশ লক্ষ টনের মত। বস্তু বলতে শুধু নিউট্রন। তাই এই ধরনের নক্ষত্রকে বলা হয় নিউট্রন নক্ষত্র।

গোড়ায় মনে হয়েছিল সবই তত্ত্বের ব্যাপার। সত্যিই এমন কোন নক্ষত্র যদি ব্রহ্মাণ্ডে থাকেও, আয়তনে এত ছোট বলে তাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করাটা কখনোই সম্ভব হবে না। আর তাদের খোঁজটাও তো দাঁড়াবে সেই যবের গাদায় একটি ছুঁচ খোঁজার মত। অথবা হাজার মাইল দূর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে ভাসমান একটি ডিঙ্গি খোঁজার মত।

কিন্তু সে আশঙ্কাও দূর হল। 1960 এর দশকে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন নতুন নতুন পদ্ধতি। তৈরি হল নতুন নতুন তত্ত্ব। তাঁরা আবিষ্কার করলেন নিউট্রন নক্ষত্রের চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসে বিশেষ কম্পাঙ্কের রেডিও তরঙ্গ। তাঁরা আবিষ্কার করলেন, নিউট্রন নক্ষত্রের কাছে থাকে আর একটি নক্ষত্র। 'যাদের বলা হয় সঙ্গী নক্ষত্র। সেই সঙ্গী নক্ষত্র থেকে গ্যাসীয় বস্তু প্রচণ্ড শক্তিতে আছড়ে পড়ে নিউট্রন নক্ষত্রের উপর। তার আঘাতে সৃষ্ট হয় একস্-রশ্মি। সেই রেডিও রশ্মি এবং একস্ রশ্মি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ধরে এবং পরে বিশ্লেষণ করে ব্রহ্মাণ্ডে সত্যিই যে নিউট্রন নক্ষত্র বিরাজ করছে সেটা প্রমাণ করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। ইতিমধ্যে কম করেও 500টি নিউট্রন নক্ষত্র আবিষ্কারও করেছেন তাঁরা।

নানা রকম চমকপ্রদ কথাও বলা হচ্ছে এখন নিউট্রন নক্ষত্র সম্পর্কে। বলা হচ্ছে, নিউট্রন নক্ষত্র হল 'আদর্শ শীতলতম বস্তু'। এদের তাপমাত্রা অবশ্য অনেক বেশি হতে পারে, কিন্তু এদের বস্তু সামগ্রীর মধ্যে এতটুকু উত্তাপ শক্তি থাকে না। বলা হচ্ছে, এ ধরনের নক্ষত্র উচ্চতাপমাত্রার অতিপরিবাহী বা সুপারকনডাকটারের মত আচরণ করে। এ ছাড়াও নিজ নিজ অক্ষের চারপাশে তারা আবর্তন করে প্রচণ্ড গতিতে। গোড়ায় যে সব নিউট্রন নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের আবর্তন বেগ প্রতি 30 মিলি সেকেণ্ডে একবার। অর্থাৎ এক একটি নক্ষত্র তার অক্ষের চারপাশে একবার ঘুরতে সময় নেই 30 মিলি সেকেণ্ড। সম্প্রতি কয়েকটি নিউট্রন নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এদের মধ্যে একটি তার অক্ষের চার পাশে একবার আবর্তন করতে সময় নেয় মাত্র 1·56 মিলি সেকেণ্ড। বুঝতেই পারছো, কি প্রচণ্ড বেগেই না ঘুরছে। বিমানবন্দরে থাকে লাইট হাউস। তার মাথায় থাকে আলো। সেই আলো একটি শলাকার উপর ঘোরে। ঘোরার সময় আলোটি যখন আমাদের দিকে ফিরে আসে। তাকে আমরা দেখতে পাই। আবার ঘুরে বিপরীত দিকে সরে গেলে দেখতে পাই না। নিউট্রন নক্ষত্রের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা গেছে। তাদের পরিমণ্ডলের বিশেষ একটি অঞ্চল থেকে বিকীর্ণ হয় রেডিও রশ্মি অথবা একস্-রশ্মি। আবর্তনের ফলে লাইট হাউসের মতই সেই রশ্মি একবার আমাদের দিকে সরে আসে, আবার বিপরীত দিকে সরে যায়। যেন একবার জ্বলে, একবার নেভে। এর জন্যেই নিউট্রন নক্ষত্রদের আর এক নাম 'পালসার'। জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে এরা এখন বিরাট এক রহস্য।

জেমস চ্যাড়উইক

লেভ ল্যানডাউ

ফ্রিৎস জুইকি

লোসেফ স্কলোভস্কি

বিজ্ঞানের খবর

দাঁতের ভবিষ্যৎ

প্রেসারকুকার আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রান্নাঘর আর রান্নাবান্নায় একটা পরিবর্তন এসেছে, একথা সবাই মানবে। কিন্তু আমাদের দাঁতেও কি সেই সঙ্গে একটা পরিবর্তন ঘটতে চলেছে? অদ্ভুত শোনালেও হয়তো কয়েক হাজার বছর পরে দেখা যাবে আমাদের দাঁত বেশ কিছুটা ছোট হয়ে এসেছে। যদি প্রেসার কুকার আবিষ্কার নাও হতো, তাহলেও আমাদের দাঁতের ছোট হওয়া আটকাতো না। কারণ, গত এক লক্ষ বছর ধরেই আমাদের অজ্ঞান্তে মুখের ভিতর ক্রমশ ছোটখাটো হয়ে আসছে দাঁতগুলো। মি. লেরিং বেস নামে একজন বিজ্ঞানী গোটা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন মিউজিয়াম থেকে আদিম মানুষের দাঁত সংগ্রহ করে আর তাদের মাপ নিয়ে নিয়ে যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে দাঁতের মাজন আর ব্রাশ তৈরির কোম্পানিগুলো যে খুব হতাশ হয়ে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ ভবিষ্যতে মানুষের মুখ থেকে দাঁত জিনিসটাই হয়তো বেপাত্তা হয়ে যাবে একেবারে। অবিশ্বাস্য! মোটেই না। ব্যাপারটা এইরকম ঃ

মুখবিবরের মাপ ছিল বড়

দাঁতের প্রয়োজন খাবারদাবারকে চিবিয়ে নরম আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে ভেঙে ফেলা, যাতে হজম করার কাজটা সহজ হয়। আদিম মানুষ কাঁচা মাংস খেত। সেই শক্ত মাংস ছেঁড়ার জন্য প্রয়োজন ছিল সবল, বড় বড় দাঁতের। কিন্তু যেদিন থেকে মানুষ আগুন জ্বালিয়ে সেই মাংস ঝলসে খেতে শুরু করল, দাঁতের উপর থেকে মাংস ছেঁড়ার কঠিন কাজ ক্রমশ সহজ হয়ে এল। সুতরাং দাঁত কিছুটা ছোট হয়ে এলেও তাতে আটকাতো না। সেই দিন থেকেই ক্রমশ দাঁত ছোট হওয়া শুরু হল। আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে এল আরেকটা পরিবর্তন। মানুষ রান্নার কাজে পাত্র ব্যবহার করতে শুরু করল। ফল হল এই, খাবারদাবার আরো নরম হতে শুরু করল, আর সেই সঙ্গে আরো দ্বিগুণ হারে ছোট হতে শুরু করল দাঁতগুলো। দাঁতের পাটির শেষ দিকে যে দাঁতগুলো দিয়ে আমরা চিবাই সেগুলোকে বলে 'মেলোর'। দাঁতের যে তল দিয়ে আমরা চিবাই, আদিম মানুষ নিয়ানডার্থালদের মেলোর দাঁতের এই তলের মোট ক্ষেত্রফল ছিল গড়ে 260 বর্গমিলিমিটার। আর আধুনিক মানুষের ক্ষেত্রে এই আয়তন কমতে কমতে হয়েছে 200 বর্গ মিলিমিটার। এখনও এই আয়তন ক্রমশ কমছে। সেই সঙ্গে আমাদের রান্নাঘরে এসেছে প্রেসার কুকার, যা দিয়ে খাবার দাবার একেবারে নরম করে নিচ্ছি আমরা।

ব্রহ্মাণ্ডের সীমানা

দৃষ্টিরও একটা সীমা আছে। বহু ক্ষীণ নক্ষত্র বা গ্যালাক্সি আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। যেগুলো বহু দূরে আছে তাদের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে এত পাতলা হয়ে পড়ে যে অতিকায় দূরবীণ ছাড়া তাদের দেখা সম্ভব হয় না। কিছু নভো বস্তু থেকে আবার আলো বেরোয় না, অথবা আলো ছাড়াও বেরোয় আরো অনেক কিছু—— এক্স-রশ্মি, গামা-রশ্মি, বেতার তরঙ্গ, অবলোহিত তরঙ্গ ইত্যাদি। এসব ধরার জন্যও আছে বিশেষ বিশেষ গ্রাহক যন্ত্র। এদের সকলের সাহায্য নিয়েই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দূরদূরান্তে নজর পাঠাতে পেরেছি আমরা। কিন্তু এই সব যন্ত্র দিয়ে দেখারও তো একটা সীমা আছে!

উনিশশো তিরিশের দশকেই এ ব্যাপারটা শোনা গিয়েছিল যে প্রতিটা নভোবস্তু আমাদের থেকে তীব্র গতিবেগে দূরে সরে যাচ্ছে। যত দূরের জিনিস আমাদের দৃষ্টিতে পড়েছে, দেখা গেছে সেই বস্তু ততোধিক দ্রুত বেগে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে! আর যে জ্যোতিষ্ক যত দ্রুত দূরে সরে যায় তার তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তত লম্বা হতে থাকে। সম্প্রতি কয়েকজন বিজ্ঞানী এমন এক-গ্যালাক্সির সন্ধান পেয়েছেন, যাদের দূরত্ব প্রায় সতেরোশো কোটি আলোকবর্ষ। এদের নির্গত আলোকরশ্মির তরঙ্গ এত

কালপুরুষ (Orion Nebula) তারামণ্ডল। যার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছতেই আলোর সময় লাগবে প্রায় পনেরো বছর

দীর্ঘ হয়ে পড়েছে যে সেগুলি দৃশ্য আলোর সীমানা ছাড়িয়ে চলে এসেছে অবলোহিত তরঙ্গের সীমানায়! খুব সূক্ষ্মযন্ত্রের সাহায্য নিয়ে তবেই এদের অস্তিত্ব টের পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে। আবিষ্কর্তারা বলেছেন, এই গ্যালাক্সিগুলিই ব্রহ্মাণ্ডের সীমান্তবাসী, তার দূরের কোনো বস্তু আমাদের নজরে আসবে না আর। খালি চোখে হোক, দূরবীণের সাহায্যে হোক, দৃষ্টির সীমানা এখানেই শেষ। কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলছেন, সতেরোশো কোটি আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সি থেকে আলো পৌঁছাতে সময় লাগে সতেরোশো কোটি বছর। তার মানে, এই গ্যালাক্সি তৈরি হয়েছিল সতেরোশো কোটি বছরেরও আগে, তার আলো মাত্র আজই আমরা আবিষ্কার করলাম। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডেরই সৃষ্টি হয়েছে, একটা মত অনুযায়ী, মাত্র দু হাজার কোটি বছর আগে। তারপর বেশ কিছু সময় গেছে নক্ষত্র বা গ্যালাক্সি সৃষ্টি হতে। তার মানে, এই আদিম গ্যালাক্সির থেকে প্রাচীন গ্যালাক্সি আর খুব বেশি নেই। এর থেকেও প্রাচীন যারা, পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব সতেরোশো কোটি আলোকবর্ষের বেশি হওয়া সম্ভব। কিন্তু তেমন গ্যালাক্সি কি আর আছে? কিছু গ্যাস আর ধূলিপুঞ্জ, যেসব থেকে এই গ্যালাক্সিগুলি তৈরি হয়েছিল, সে সবই একমাত্র থাকতে পারে সতেরোশো কোটি আলোকবর্ষ সীমানার ওপারে। তারা যে আছে, এটা আমরা কল্পনা করতে পারলেও তাদের দেখতে পাবো না কোনোদিন। কারণ এই সব বস্তু মোটেই উজ্জ্বল নয়। সেখান থেকে আলো বা কোনো রশ্মি এসে পৌঁছবে না পৃথিবীতে। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের সীমানায় দুটি খুঁটির মত দাঁড়িয়ে আছে এই দুটি আদিম গ্যালাক্সি, যাদের ওপার আর আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়। আপাতত, ব্রহ্মাণ্ডের সীমান্তবর্তী এই রকম আরো কিছু গ্যালাক্সির সন্ধানে এই বিজ্ঞানীরা অনেক আশা নিয়ে আকাশে চেয়ে আছেন।

যুধাজিৎ দাশগুপ্ত

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মাবলী

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য 4·50 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র (April-March) গ্রাহক চাঁদা 50·00 টাকা। হাতে বই নিলে গ্রাহক চাঁদা 40·00 টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- Under Certificate of Posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত 3000 টাকা পাঠাতে হবে।
- M O বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।
- 25 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।
- ভি. পি. পি বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো সংখ্যাপিছু গ্রাহকদের 1·00 টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে।

লেখকদের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী যে কোন বিজ্ঞান রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশের জন্য পাঠানো যেতে পারে।
- পাতার একদিকে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রতিটি রচনার সঙ্গেই ছবি পাঠাতে হবে।
- প্রেরিত রচনা এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে অনুমোদিত হয়নি বলে ধরে নিতে হবে।

প্রাণী-বিচিত্রা • শৈল চক্রবর্তী

ডায়নোসর এককালে পৃথিবীতে রাজত্ব করত। বহুলক্ষ বছর আগেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কিন্তু তাদের প্রায় সমসাময়িক করেকটি জীব পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে এখনও টিঁকে আছে। তাদের মধ্যে প্লাটিপাস, অপোসাম, স্লথও আরো কয়েকটি জীব।

নির্বাচিত প্রবন্ধ গুচ্ছ

জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ বিমাণ বসু ॥ জয়ন্ত বসু ॥ সূর্যেন্দু বিকাশ করমহাপাত্র ॥ আবদুল্লাহ আলমুতী ॥ রমাতোষ সরকার ॥

পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গেলেও যে
বইয়ের প্রয়োজন ফুরোয় না

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

বিষয়সূচী

অপ্রকাশিত রচনা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের
অপ্রকাশিত পত্রাবলী

বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অদ্রীশ বর্ধন
ও সমরজিৎ কর

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
সংকর্ষণ রায় ॥ নারায়ণ সান্যাল
কিন্নর রায় ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী

রঙিন চিত্রকাহিনী

দিলীপ দাস ॥ গৌতম কর্মকার

নিজে নিজে কর

বিপ্লব ব্যানার্জী ॥ সৌম্য মিত্র ॥ দিলীপ পাঠক
নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র ও অনেকে

সচিত্র প্রবন্ধ : বিচিত্র জীবজগৎ

রতনলাল ব্রহ্মচারী ॥ অজয় হোম ॥ সুবীর দত্ত
তপন কুমার আদক ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস
তারক মোহন দাসও অনেকে

নির্বাচিত পুনর্মুদ্রণ

জগদীশ চন্দ্র বসু ॥ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
ও অন্যান্য

ছড়া ও কবিতা

অন্নদাশংকর রায় ॥ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
কৃষ্ণ ধর ॥ অমিতাভ চৌধুরি ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু
অমিত রায় ও অনেকে

এ ছাড়া অজস্র আকর্ষণ

বেরোবে মহালয়ার আগেই

পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গেলেও যে
বইয়ের প্রয়োজন ফুরোয় না

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

বিষয়সূচী

বিজ্ঞানভিত্তিক অনুবাদ গল্প

ধরণী ঘোষ ॥ সৌরেন ভট্টাচার্য এবং
এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

দিলীপ সিংহ ॥ সুধাংশু পাত্র ॥ বিমান বসু
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দিবাকর সেন ॥ অমিত
চক্রবর্তী ॥ মৃন্ময়ী দাস ॥ আবদুল হক খন্দকার ॥
অলক সেন। অসীমা চট্টোপাধ্যায় ॥ রতন মোহন
খান ॥ অশোক দাস ও উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

হাতে-কলমে এক্সপেরিমেন্টস

অপরাজিত বসু ॥ সমীর কুমার ঘোষ ॥
সন্তোষ মিত্র ॥ শাহজাহান তপন ও
সুকুমার গুপ্ত

রোমাঞ্চকর প্রবন্ধ

জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার ॥ শ্রীপান্থ

পড়াশোনা

অমরনাথ রায় ॥ সমীরকুমার ঘোষ
সুধাংশু পাত্র ॥ অসীম কুমার মুখোপাধ্যায়
ও বিভাবসু ঘোষ

প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার

ক্যুইজ কনটেস্ট ॥ আইকিউ টেস্ট ও
অনেক নতুন প্রতিযোগিতা

এ ছাড়া অজস্র আকর্ষণ

বেরোবে মহালয়ার আগেই

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

মুদ্রা নিয়ে কত কাণ্ড

তোমাদের মধ্যে অনেকের হয়ত ডাকটিকিট জমানোর অভ্যেস আছে। ছোটদের অনেকেই টুকিটাকি অনেক কিছু জমায়। তবে বড়দের মধ্যে যখন এই অভ্যেস আসে তখন তা কখনো কখনো সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে পুরানো জিনিস বা শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করার অভ্যেস কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে নানান বয়সের লোকের মধ্যে খুবই আছে। কি না সংগ্রহ করে তারা। মূর্তি, মুদ্রা, বই, ছবি, চিনামাটির পাত্র। ধাতুর তৈরি নানা জিনিস। মূল্যবান সংগ্রহের কতগুলি বিশেষত্ব থাকে। বহু পুরানো জিনিস, শিল্প সংক্রান্ত গুণাবলীর জন্য বিখ্যাত। ঐতিহাসিক বস্তু অথবা দুষ্প্রাপ্য বস্তু। এক একটি সংগ্রহের বস্তু আবার সংগ্রাহকেরা বহু বহু টাকায় কিনে থাকে। কখনো আবার কে কত বেশি টাকায় কিনবে তার প্রতিযোগিতা চলে।

সম্প্রতি একটি সংবাদ পড়ে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সেটা তোমাদের জানানোর জন্য ছটফট করছিলাম। সুইজারল্যাণ্ডে একজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে একটি ভারতীয় মুদ্রা আছে। সেটি বিক্রী করার জন্য নীলাম করা হবে। সেই সংবাদ ওখানকার ভারতীয় দূতাবাসের কাছে পৌঁছানো মাত্র নীলাম আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। ভারত সরকার যদি কোনভাবে মুদ্রাটি ভারতে ফিরিয়ে আনতে পারে তার চেষ্টা চলছে। সংগ্রাহক ঐ মুদ্রাটির দাম আশা করছে আঠারো কোটি টাকারও বেশি। শুনতে অবাক লাগলেও ব্যাপারটি সত্যি। কি কি কারণে মুদ্রাটি বিশেষ? প্রথমত মোঘল বাদশা জাহাঙ্গীরের তৈরি ঐ মুদ্রা। দ্বিতীয়ত অসাধারণ শিল্পকর্মের নিদর্শন সেটি। তৃতীয়ত নির্ভেজাল বারো কিলোগ্রাম সোনায় তৈরি। সবশেষে বাদশা ঐ মুদ্রা কেবল মাত্র একটাই বানিয়েছিলেন। তাই জগতে অসাধারণ শিল্প সম্মত ঐতিহাসিক ঐ মুদ্রাটির কোন জুড়ি নেই।

মুদ্রার কথা যখন উঠলো তখন মুদ্রা বিষয়ে সহজ একটি ধাঁধা দিয়ে শেষ করি। তোমার কাছে চার টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা আছে, সবটাই মুদ্রাতে আছে। টাকার মুদ্রা দশ পয়সা আর এক পয়সার মুদ্রাই শুধুমাত্র আছে। মোট মুদ্রার সংখ্যা বিয়াল্লিশ। কোন মুদ্রা কটা করে আছে? কতভাবে এর সমাধান হতে পারে?

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি

কম্পিউটারে তথ্য আদান প্রদানের জন্য ASCII বা অন্যান্য কোড ব্যবহার করা হলেও অঙ্ক কষার সময় ব্যবহার করা হয় বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary number system)। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কিন্তু ASCII বা EBCDIC কোডের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কোডগুলি হলো স্রেফ একটি তালিকা যাতে বলে দেওয়া হয়েছে কোনো অ্যালফানিউমারিক ক্যারেকটার বোঝাতে গেলে কত বাইনারি সংখ্যা লিখতে হবে। কিন্তু বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কত দশমিক সংখ্যা বোঝাতে কত বাইনারি সংখ্যা লিখতে হবে সেটি গণিতের ফর্মুলার ওপর ভিত্তি করে স্থির করা হয়েছে। তাই বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে লেখা সংখ্যা দিয়ে অঙ্ক করা যায় যেহেতু তাতে বাইনারি অ্যালজেব্রার নিয়মকানুন প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু কোনো কোডে লেখা সংখ্যা দিয়ে কম্পিউটার অঙ্ক কষতে পারে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 7 bit ASCII কোডে দশমিক 0 সংখ্যা লেখা হয় 0110000 বাইনারি সংখ্যার দ্বারা। এই 0 সংখ্যাটিকেই যখন অঙ্কের কাজে লাগাতে হয়, তখন কম্পিউটার তাকে বাইনারি নাম্বার সিসটেম অনুসারে 0000000 বাইনারি সংখ্যায় বদলে নেয়। অঙ্ক কষা হয়ে যাবার পর যখন উত্তর নামাবার সময় আসে তখন কম্পিউটার ফের বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যাটিকে ASCII বা অন্য কোডে বদলে দেয়।

কিভাবে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে কেবল মাত্র দুটি এক অঙ্কের সংখ্যা আছে 0 আর 1। গণিতের ভাষায় একে বলা হয় Radix। তাই বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির র‍্যাডিক্স (Radix) বা বেস (Base) হলো 2। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো আমরা যে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি তার র‍্যাডিক্স হলো 1 0 কারণ তাতে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এবং 9 এই দশটি আলাদা আলাদা এক অঙ্কের (digit) সংখ্যা আছে। আমরা দশমিক পদ্ধতিতে যে কোনো সংখ্যা ওই দশটি মৌলিক এক অঙ্কের সংখ্যাকে বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে লিখতে পারি যেমন 1, 7 এবং 9 কে পরপর লিখলে দাঁড়ায় একশো উনোআশী (179)। ঠিক তেমনি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতেও যাবতীয় সংখ্যা ওই 0 এবং 1 কে বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে লেখা হয়। যেমন শুধু যদি একটা বা অনেক গুলি 0 পরপর বাইনারি পদ্ধতিতে লেখা হয় তবে সেটা দশমিক পদ্ধতির 0 বোঝায়।

বাইনারি	দশমিক
00000000	0
00000001	1
00000010	2
00000011	3
00000100	4
001 0000	48
10110011	179

যদি কেবল মাত্র 1 লেখা হয়, তবে সেটা দশমিক 1 বোঝায়। বাইনারি 10 লিখলে সেটি বোঝায় দশমিক 2 ইত্যাদি। বাইনারি দশমিকের তুলনামূলক উপরের তালিকাটিতে চোখ বোলালেই ব্যাপারটি বোঝা যাবে।

মনে রাখতে হবে দশমিক পদ্ধতির মতই বাইনারিতেও বাঁ দিকে অজস্র শূন্য লেখার কোনোই মানে নেই। সেই হিসেবে 0000001 লেখাও যা, শুধু 1 লেখাও তাই। তবে কম্পিউটারের C.P.U. যেহেতু এক সঙ্গে অনেক বিট্ (8, 16 32 কিম্বা 64) সংখ্যা এক সঙ্গে পড়ে, তাই বাঁ দিকে অপ্রয়োজনীয় বিট্গুলিতেও সর্বদা কোনো না কোনো বাইনারি সংখ্যা দিতেই হয়। সেই জন্যই 8 বিট্ কম্পিউটারের ক্ষেত্রে 1 বোঝাতে শুধু 1 বিট্ তথ্য পাঠালে চলে না। পুরো 8 বিট্ 00000001 সংখ্যাটি পাঠাতে হয়।

বাইনারি নাম্বার সিসটেমের নিয়মানুসারে ASCII কোডে লেখা 00110000 সংখ্যাটি বাস্তবে দশমিক পদ্ধতির 48কে বোঝায়। ঠিক তেমনি 179 দশমিক সংখ্যাটি বাইনারিতে লেখা হয় 10110011 এর সাহায্যে। কি ভাবে বলছি—এর জন্য অত্যন্ত সহজ দুটি ফর্মুলা আছে। একটি ফর্মুলার সাহায্যে আমরা যে কোনো বাইনারি সংখ্যা

কত দশমিক সংখ্যার সমান বার করতে পারি। আর অন্যটির সাহায্যে যে কোনো দশমিক সংখ্যার সমান বাইনারি সংখ্যাটি কত হবে তা বার করতে পারি।

বাইনারি থেকে দশমিকে পরিবর্তন

যে কোনো একটি বাইনারি সংখ্যা ধরা যাক—10101101 এর সব থেকে ডান দিকে যে 1 বিট্‌টি বসে আছে, গণিতের ভাষায় তার Position weight হলো শূন্য। এর ঠিক বাঁ দিকে যে 1টি আছে, আর Position weight হলো 1। এই ভাবে যতই বাঁ দিকে যাওয়া যাবে, Position weight ও ততই বাড়বে। সেই হিসেবে সব থেকে বাঁ দিকের 1 bitটির Position weight হবে 7।

বাইনারি থেকে দশমিকে পরিবর্তনের নিয়মটি হলো Position এ যে বিট্‌টি বসে আছে, সেই বিট্‌টিকে 5 to the power Position weight দিয়ে গুণ করতে হবে। তারপর সবকটি গুণফল একত্রে যোগ করে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। সেটিই হবে ওই বাইনারি সংখ্যাটির সমান দশমিক সংখ্যা।

সুতরাং 10101101 এর সমান দশমিক সংখ্যাটি হবে—

$$(1\times 10^7)+0\times 10^6)+(1\times 10^5)+(0\times 10^4)+$$
$$(1\times 10^3)+(1\times 10^2)+(0\times 10^1)+(1\times 20^0)$$
$$=128+32+8+4+1=153।$$

দশমিক থেকে বাইনারিতে পরিবর্তন

এই কাজটিও অত্যন্ত সহজ। যে দশমিক সংখ্যাটির বাইনারি বার করতে হবে তাকে 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে। তারপর ভাগফলকে পুনরায় 2 দিয়ে 2 ভাগ করতে হবে। এই ভাবে ক্রমাগত ভাগ করে যেতে হবে। প্রতিটি ভাগের শেষে যে ভাগশেষ থাকবে, তাকে এক পাশে লিখে রাখতে হবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ভাগশেষটি সর্বদা হয় 1 নয়তো 0 হবে। এই ভাগ করতে করতে এক সময় দেখা যাবে ভাগফল 1 এ এসে দাঁড়িয়েছে। তখন ওই ভাগফলকে এক জায়গায় লিখে তার ডান দিকে পর পর ক্রমান্বয়ে শেষ থেকে গোড়ার দিকের ভাগশেষগুলি লিখলেই বাইনারি নম্বরটি পাওয়া যাবে।

যদি আমরা 179 নম্বরটি উদাহরণ হিসেবে ধরি তবে উপরের পদ্ধতি মতো ভাগ করলে ব্যাপারটি দাঁড়াবে এই রকম—

```
2 ) 179 ( 89          2 ) 89 ( 44
    16                    88
    ——                    ———
     19                    1——1
     18
     —
     1——1
```

কমপিউটার ট্রেনিং

এর বিশদ বিবরণের জন্য কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার উল্লেখ করে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগাযোগ করতে পারো।

1. **কমপিউটার (ই ডি পি) ট্রেনিং**
   নাইস, 9 ক্লাইভরো, কললাতা-14
   ব্রাঞ্চ অফিস ঃ 77 লেনিন সরণী 2য় তল কল-13
2. **মডার্ন ইলেকট্রনিক ডাটা কনসালট্যান্সী**
   C G 216 সেকটর II সল্টলেক, কল-91
   ব্রাঞ্চ ঃ শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয় ক্যাম্পাস
   62 শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলকাতা-4
3. **ইনস্টিটিউট অব মেকানাইজড্ অ্যাকাউন্টিং**
   10 কাশীনাথ দত্ত রোড, কল-36
4. **দি ব্রিটিশ ইন্সটিটিউট**
   13/1A গভঃ প্লেস ইস্ট, কল-69
5. **লাখোটিয়া কমপিউটার সেন্টার**
   P-16 সি আই টি রোড, কল-14
6. **কমপিউটার লিঙ্কস**
   11 পোলক স্ট্রীট, ফার্স্ট ফ্লোর, কল-1
7. **ইন ফো টেক**
   11 শীতলাতলা স্ট্রীট, কল-56
8. **নিউ ম্যানস কমপিউটার সেন্টার**
   3 ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলকাতা-1
9. **এ. সি. সি. কমপিউটার ডিভিসন**
   মার্কেন্টাইল বিল্ডিং 'ই' ব্লক ফোর্থ ফ্লোর
   9/12 লালবাজার স্ট্রীট, কল-1
10. **ইনটারন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব ভোকেশন্যাল ট্রেনিং**
    73/1 পাম এ্যাভেনিউ, কল-19
11. **মাইক্রোসফট্**
    2/4, জি. টি. রোড (সাউথ) হাওড়া
12. **দি সেন্টার ফর ভোকেশন্যাল স্টাডিজ**
    5 লিনডসে স্ট্রীট, কলকাতা-87

2) 44 (22
44
——
0——0

2) 22 (11
22
——
0

2) 11 (5
10
——
1——1

2) 5 (2
4
——
1——1

2) 2 (1 ভাগ ফল
2
——
0 ——0

সুতরাং 1 ভাগফলকে প্রথমে লিখে তারপর শেষ থেকে গোড়ার দিকের ভাগশেষগুলি লিখলেই উত্তর পাওয়া যাবে— 10110011

এই শব্দগুলি মনে রাখতে হবে

ASCII—American Standard Code for Information Interchange

EBCDIC—(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)

Alphanumeric—ইংরিজি বর্ণমালার সমস্ত হরফ, 0 থেকে 9 অবধি সংখ্যা এবং কমা সেমিকোলোন ইত্যাদি Punctuation mark ও গণিতের চিহ্নগুলিকে একত্রিত ভাবে বলা হয় অ্যালফানিউমারিক ক্যারেকটার।

Decoder—কম্পিউটার থেকে Out put device এ পাঠানো বাইনারি কোডকে পুনরায় আমাদের বোধগম্য অ্যালফানিউমারিক হরফে পরিবর্তন করার সার্কিট।

Encoder—Input device এর সংকেতকে কম্পিউটার বোধ্য বাইনারি কোডে পরিবর্তন করার সার্কিট।

সংকলিত কিশোর কাহিনী

ধীরেন্দ্রলাল ধর
অ্যাডভেন্চ্যার অমনিবাস
রুদ্ধশ্বাস ৫টি কাহিনীর সংকলন। ১ম খণ্ড ॥ ২৫.০০
অ্যাডভেন্চার অমনিবাস
ঐতিহাসিক ৫টি রুদ্ধশ্বাস কাহিনী। ২য় খণ্ড ॥ ২৫.০০
অ্যাডভেন্চার অমনিবাস
তৃতীয় (শেষ খণ্ড) ॥ ৩০.০০
ধীরেন্দ্রলাল ধর সম্পাদিত
কিশোর উপন্যাস সংগ্রহ
বিখ্যাত পাঁচজন শিশুসাহিত্যিকের রহস্য ও রোমাঞ্চে আবৃত ৫টি গোয়েন্দা কাহিনী একত্রে ॥ ২৫.০০

কিশোর গল্প সংকলন

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাছাই গল্প
ভৌতিক, রহস্য ও ঘনাদার আত্মকাহিনী একত্রে ॥ ১২.০০
লীলা মজুমদার ॥ **গল্প সল্প**
উঠতি পড়ুয়াদের জন্য মজলিসি গল্পাবলী ॥ ১২.০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **একটি লাল লঙ্কা**
বিচিত্র গল্পাবলীর সংকলন ॥ ১৫.০০
কুমারেশ ঘোষ ॥ **হরেকরকম্বা**
৯৫ থেকে ৬৫ বয়সের পড়ুয়াদের রসভাণ্ডার ॥ ১২.০০
বিমলেন্দু চক্রবর্তী ॥ **শুশুনিয়ার রহস্য**
একটি কিশোরের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কাহিনী ॥ ১২.০০
লুপ্ত নগরের গুপ্তধন ॥ ১০.০০

রূপকথার সিরিজ

গৌরী ধর্মপাল ॥ **কালো মানিক**
শিশুদের উপযোগী অসাধারণ রূপকথা ॥ ১২.০০
ডঃ তৃপ্তি ব্রহ্ম ॥ **রুশী রূপকথা**
রুশ গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত রূপকথা ॥ ৬.০০

বিজ্ঞান ভিত্তিক রচনা

সুর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র
মহাবিশ্বের কথা
মহাবিশ্বের নানা জানা ও অজানা রহস্যের সরস ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা। অসংখ্য চিত্র ও ডায়াগ্রাম সংবলিত।
[সম্ভাব্য প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮]

সাহিত্য বিহার ● ১বি মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কল-৯
পরিবেশক : **ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী**
৫৬ সূর্য সেন স্ট্রীট, কল-৯

ম্যাগনেসিয়াম

অমরনাথ রায়

ম্যাগনেসিয়াম এবং তার বিভিন্ন যৌগাবলী, যথা ট্যাল্‌ক, অ্যাসবেস্টস, ডলোমাইট এবং নেফ্রাইট অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের পরিচিত ছিল এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতো। আদ্যিকালে অবশ্য এই সব পদার্থগুলিকে একে অন্যের থেকে পৃথক বলে গণ্য করা হতো না, পরন্তু এগুলিকে লাইম বা চুনের বিভিন্ন রূপ হিসাবে গণ্য করা হতো। 1618 খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ইপসম নামক স্থানে H. Wikar খনিজ ঝর্ণা আবিষ্কার করেন। 1695 খ্রীস্টাব্দে তিনি তিক্ত স্বাদ যুক্ত একটি লবণ (ইপসম ঝর্ণার জলে) আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে তা ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে কৃত্রিম ইপসম লবন ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$ এবং গ্লবার লবণের ($Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$) মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। বিজ্ঞানী J. Black-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই দুই লবণের দ্রাব্যতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। 1808 খ্রীস্টাব্দে রসায়ন বিজ্ঞানী হামফ্রি ডেভি সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ধাতু নিষ্কাশনের জন্যে ব্যবহৃত ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা প্রথম প্রয়োগ করেন এবং অতি সামান্য পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম (অবিশুদ্ধ) প্রস্তুত করতে সমর্থ হন। ফরাসী রসায়নবিদ A. Bassy ই প্রথম ব্যক্তি যিনি অধিক পরিমাণ বিশুদ্ধ ম্যাগনেসিয়াম 1831 খ্রীস্টাব্দে নিষ্কাশনে সমর্থ হন।

ম্যাগেনেসিয়াম নামটি এসেছে—এশিয়া মাইনরের একটি জেলা 'ম্যাগনেসিয়া' থেকে। ম্যাগনেসিয়ামের চিহ্ন Mg, পরমাণু ক্রমাংক 12, পারমাণবিক গুরুত্ব 24·32, ঘনত্ব 1·738 গ্রাম/সি.সি, গলনাংক 650°C এবং স্ফুটনাংক 1100°C. এই ধাতুটি দেখতে রূপার মত সাদা রঙের এবং খুব হালকা। লঘু অ্যাসিডে এই ধাতুটি দ্রাব্য কিন্তু ক্ষারে অদ্রাব্য। ম্যাগনেসিয়াম ক্ষারীয় মৃত্তিকা শ্রেণীর মৌল। প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় এই মৌলটিকে পাওয়া যায় না, তবে এর যৌগ যথা ডলোমাইট, ম্যাগনেসাইট, অলিভাইন নামক খনিজ পদার্থে পাওয়া যায়। সাগরের জলে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড যৌগ আছে।

ম্যাগনেসিয়াম রূপার মত সাদা ধাতু। প্রসারণশীল ধাতু এবং মোটামুটি শক্ত। একে টেনে তার এবং পিটিয়ে পাতে পরিণত করা যায়। মৌলটি তড়িৎ পরিবাহী এবং শীতল জলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। মৌলটি অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সাধারণ উষ্ণতায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর তার উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে জ্বলে। ম্যাগনেসিয়াম ও পারদের সংকর ধাতু জলের সঙ্গে তীব্র বিক্রিয়া ঘটায়। বাজি হিসাবে ম্যাগনেসিয়াম তারের প্রজ্জ্বলন এখনও সুবিদিত। গ্রিগনার্ড বিকারক' প্রস্তুতিতে ম্যাগনেসিয়াম ব্যবহৃত হয়। ম্যাগনেসিয়াম খুবই লঘুভার মৌল। অ্যালুমিনিয়ামের চেয়েও হাল্‌কা। অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে সংকর ধাতু রূপে এই মৌলটি ব্যবহৃত হয়। ম্যাগনেসিয়ামের সংকর ধাতুগুলির মধ্যে অন্যতম হলো ম্যাগনেসিয়াম, ইলেকট্রন ধাতু এবং ডাও ধাতু (Dow metal)। ডাও ধাতুতে 90% ম্যাগনেসিয়াম এবং অবশিষ্টাংশ অ্যালুমিনিয়াম আছে। আর ম্যাগনেসিয়ামে 30% ম্যাগনেসিয়াম ও অবশিষ্টাংশ অ্যালুমিনিয়াম আছে। হাল্‌কা অথচ মজবুত যন্ত্রাংশ নির্মাণে ম্যাগনেসিয়ামের সংকর ধাতুগুলি ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ম্যাগনেসিয়ামের সিলিকেট যৌগ হলো অ্যাসবেস্টস—যা দিয়ে ঘরের ছাদ তৈরি হয় এবং অগ্নিনিরোধক পোশাক প্রস্তুত হয়।

ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হলে পাওয়া যায় ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড। এটি অম্লরোধক (antacid) ও রেচক ওষুধ (laxative) রূপে ব্যবহৃত হয়। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড যৌগটি একটি দুর্গল (refractory) পদার্থ। এটি খুব উচ্চ উষ্ণতায় গলে। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড এবং ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রণকে ভিজিয়ে নিলে তা অল্প সময়ের মধ্যেই শক্ত পিণ্ডে পরিণত হয় এবং তাকে আমরা বলে থাকি সোরেল সিমেন্ট। এ হেন প্রয়োজনীয় মৌলটির আমরা কোন দিনও অভাব বোধ করব না, যদি আমরা সাগরের জল থেকে ম্যাগনেসিয়াম উদ্ধার করতে পারি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : (i) মহাবিশ্বের মৌল উপাদান by আইজাক অ্যাসিমোভ (ii) Chemical elements by D.N. Trifonov and V.D. Trlfonov.

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সাপ ও সাপের বিষ

ননীগোপাল মণ্ডল

বাপী-বুড়ু বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল। সঙ্গে দাদু-ঠাকুমাও ছিলেন। ফিরে এসে কচিকাকুর কাছে বর্ণনা করছে নানা ধরনের অভিজ্ঞতার কথা। একদম ঠাকুরচক থেকে শুরু করে আগ্রা দিল্লী পর্যন্ত তাদের বাস ও রেলগাড়ী ভ্রমণ বর্ণনা করল। বাপীর সবচেয়ে ভালো লেগেছে আগ্রার তাজমহল। এর আগে ইতিহাসে তার সৌন্দর্য সম্পর্কে পড়েছে। কিন্তু এত সুন্দর জিনিস চোখে দেখবে বা ছবি তুলবে ভাবতেও পারে নি। বুড়ুর ভালো লেগেছে সবকিছু। কিন্তু এলাহাবাদের ফুটপাতে সাপের খেলা তার সারা জীবন মনে থাকবে। বুড়ুর কথা শেষ হতে না হতে বাপী বলল "দুমুখো সাপ দেখে তার ভীষণ ভালো লেগেছে"। বুড়ুর ভালো লেগেছে সাপের গোঁফ ও মাথার মণি দেখে। এছাড়া সাপকে আঘাত করলে সাপ তাকে চিনে রাখে এবং সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নেয়।

এতক্ষণ নীরব শ্রোতা হয়ে ওদের কথা শুনছিলেন কচিকাকু। এবার কিন্তু আর না হেসে পারলেন না। বললেন, "বোকা ছেলে-মেয়ে, তোমরা যা বলছ তার কোনটাই সত্যি নয়। আসলে ওরা পয়সা রোজগার করার জন্য ঐ সমস্ত মিথ্যা কথা বলে মানুষকে ঠকায়।

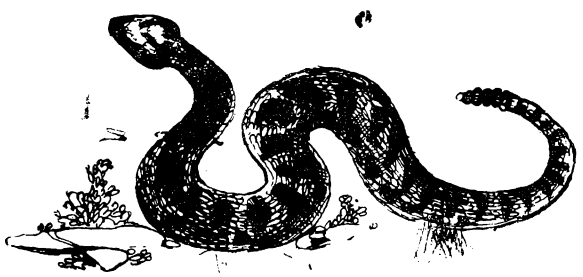

র‍্যাটেল স্নেক বা ঝুমঝুমি সাপ

কচিকাকুর কথা শেষ হতে না হতে তীব্র প্রতিবাদ জানায় বুড়ু। কারণ সে নিজের চোখেই দুমুখো সাপ দেখেছে। গোঁফদাড়িও দেখেছে।

এবার কচিকাকু বলতে শুরু করেন পৃথিবীতে সাপ প্রায় আড়াই হাজার প্রজাতির আছে। এদের কোন কোন প্রজাতির লেজটা ভোঁতা। এই ভোঁতা লেজ দেখিয়ে সাপুড়েরা মানুষকে ঠকায়। একই ভাবে ঠকায় গোঁফ দেখিয়েও। কারণ সাপের কোন ঘর্মগ্রন্থি নেই বলে এদের গোঁফ দাড়ি থাকাও অবৈজ্ঞানিক। খোলস ত্যাগ করার সময় কোন অংশ লেগে থাকলে তাকে গোঁফ দাড়ি বলে চালায়। আর মণির কথা, ওগুলো উজ্জ্বল পাথর ছাড়া আর কিছুই না। মানুষকে প্রতারিত করতে ওগুলো এরা দেখায়। আরও শুনলে অবাক হবে সাপের কোন বহিঃকান বা অন্তঃকান থাকে না। তাই এরা একদম শুনতে পায় না।

—তাহলে বাঁশির সুরে সুরে নাচে কেমন করে? বাপী কচিকাকুকে প্রশ্ন করে।

—সাপ কালা হলেও এদের অনুভূতি খুবই প্রখর। সাপুড়েরা যখন ডুগডুগি বাজায় বা বাঁশি বাজিয়ে লোক জড়ো করার চেষ্টা করে তখন পায়ের সাহায্যে মাটিতে মৃদু কম্পন সৃষ্টি করে। আর তাতেই এরা (সাপেরা) সজাগ হয়ে যায়! তাইতো ঝাঁপি থেকে সাপ বের করার আগে টোকা দিয়ে সাপকে জাগিয়ে তোলে। আর সাপ যে নাচতে থাকে তা বাঁশির সুরে নয়. বাঁশিওয়ালার দুলুনির তালে তালে।

—বুড়ু বলল, সাপের এত কথা আমরা জানতাম না। ওদের খাদ্য সম্পর্কে একটু বল না।

—সাপ মাংসাশী প্রাণী। এরা নদী, নালা, খাল, বিল, আলপথে, পোড়ো বাড়ী ইত্যাদি জায়গায় থাকে। ব্যাঙ, ইঁদুর, টিকটিকি, গিরগিটি, খরগোশ, পাখীর বাচ্চা ও বিভিন্ন ধরনের পোকা মাকড় এদের প্রিয় খাদ্য। এরা দুধ-কলা মোটেই খায় না। অনেকে বলে এরা নাকি গরুর বাঁট থেকে দুধ চুষে খায়। কিন্তু এদের জিভ চেরা এবং ফুসফুস এতই দুর্বল যে কোন কিছু শুষে নেওয়া এদের দ্বারা সম্ভব নয়।

—এরা কি হিংসা পরায়ণ?

— না, এরা হিংসা পরায়ণ না। অপর পক্ষে এরা বেশ ভীতু ও পলায়ন পটু। আত্মরক্ষার জন্য অনেক সময় ভীত হয়ে এরা ছোবল বসায়। এরা শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী এবং হৃৎপিণ্ড খুবই দুর্বল। ফলে অল্পেতেই এরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এরা ঘণ্টায় ছয় কিলোমিটারের বেশী ছুটতে পারে না। আফ্রিকার মাম্বা প্রজাতির একধরনের সাপ ঘণ্টায় এগার কি.মি. পর্যন্ত ছুটতে পারে।

—সাপের পা তো থাকে না। এরা পেটের তলায় এক ধরনের আঁশের সাহায্যে চলাফেরা করে। তাই না কচিকাকু! বাপী প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। তবে এরা মাঝে মাঝে খাড়া হয়ে দাঁড়াতেও পারে। সাপ ফোনা তুলে দাঁড়ালে প্রায় এক-ফুটেরও বেশী উপরে উঠতে পারে। কিন্তু দুটি পুরুষ সাপ

যখন লড়াই করে তখন এরা প্রায় দুই থেকে তিন ফুট উপরে (পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে) খাড়া হয়ে উঠে। একে শংখ লাগা বলে।

—অনেক ধরনের তো সাপ আছে। কিন্তু বিষধর সাপ বেশি না বিষহীন সাপ বেশি। আর প্রকৃত বিষটাই বা কী?

—আগে বলেছি পৃথিবীতে প্রায় আড়াই হাজার প্রজাতির সাপ আছে। এদের মধ্যে মাত্র সাড়ে চারশ' সাপের মধ্যে বিষ আছে। আবার মাত্র দু'শ সাপের ছোবলে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। তাদের মধ্যে ভারতের সাধারণতঃ কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া, শাঁখামুটি, কালাচিতি, কচড়াচিতি

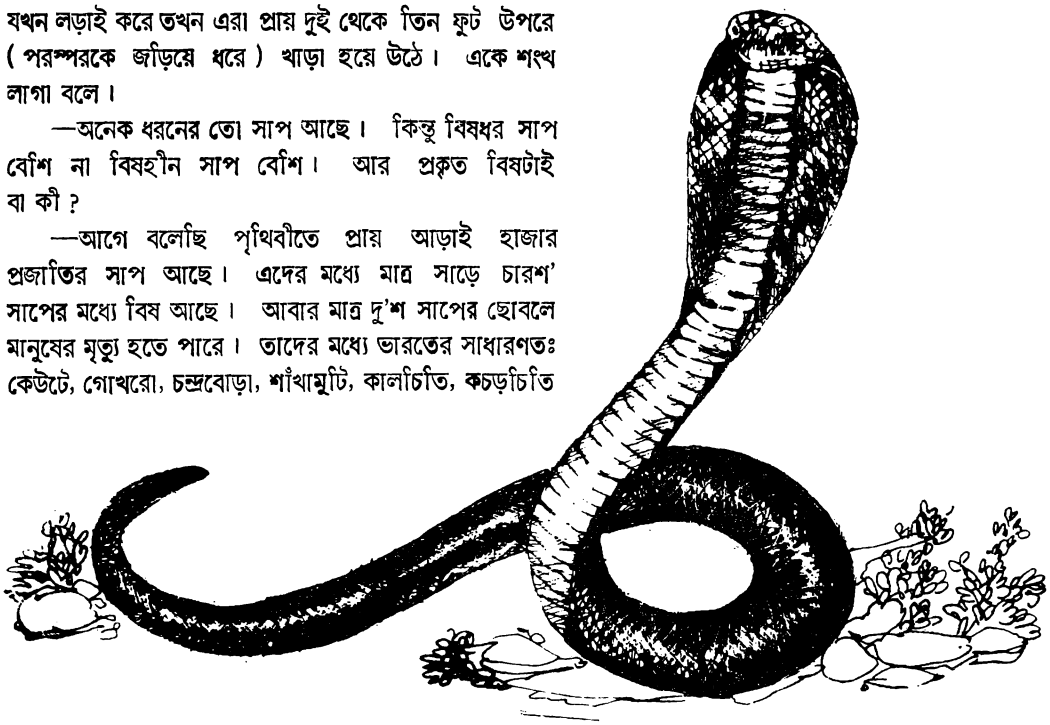

ভারতীয় কেউটে

কোঠর নাগ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

বিষটা প্রকৃত পক্ষে এক প্রকার প্রোটীন জাতীয় পদার্থ। এতে থাকে টক্স-অ্যালবুমিন, কিছু খনিজ পদার্থ উৎসেচক আর নিউরো টক্সিক, কার্ডিটক্সিন এবং হেমারিজিন। আর এই বিষ কাজ করে রক্তের সাহায্যে।

—সে তো বুঝলাম। কিন্তু মানুষের রক্তে ঐ বিষটা কিভাবে আসে? বুড়ুর প্রশ্ন।

—সাপের বিষ থলি থাকে উপরের তালুর ভিতরের দিকে। ছোবল দেওয়ার সময় হঠাৎ টেম্পোরাল বা ম্যাসেটারা পেশি থলিতে চাপ দেয়। ফলে থলি থেকে বিষ চলে আসে দাঁতের গোড়ায়। সাপের দাঁতগুলি ইনজেকশনের সূঁচের মতো ফাঁপা। ফলে দাঁতের ভিতর দিয়ে বিষ চলে আসে দাঁতের ডগায় এবং ছোবলের সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় শিকারের শরীরে। শরীরে বলতে রক্ত নালীর মধ্যে।

এই বিষ মানুষের রক্তে প্রবেশ করার পর তার ক্রিয়া শুরু করে দেয়। প্রথমে এরা লোহিত রক্ত কণিকাগুলিকে মেরে ফেলে এবং শ্বাসকার্য এতে ব্যাহত হয়। গোখরা ও অস্ট্রেলিয়ার ডেথ অ্যাডাড সাপের ছোবলে এই ক্রিয়া দেখা যায়। এরপর স্নায়ুগুলিকে নিষ্ক্রিয় ও রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে দেয়। টাইগার সাপের বিষে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এছাড়া এই বিষ সরু সরু রক্ত নালীর এণ্ডোথেলিয়ামকে নষ্ট করে দেয়, ফলে রক্ত-নালী থেকে রক্ত পেশীতে চলে আসে। আরও একটা কথা জেনে রাখ, মাম্বা সাপের নিউরোটক্সিক বিষ মাত্র আঠার থেকে কুড়ি মিনিটে মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঘুম পাড়িয়ে দিতে সক্ষম।

—সাপের ছোবলের প্রতিষেধক কী এবং এর প্রাথমিক চিকিৎসা কী? ওঝাদের প্রভাব রোগীকে কতটা উপশম দিতে পারে?

—বাপী, তোমার প্রশ্নের শেষ দিক থেকে উত্তর দিচ্ছি। তার আগে একটা কথা বলে রাখি, সাপের কামড়ে, বিষের থেকে সাপের আতঙ্কে অনেক বেশি রোগীর জীবন হানি হয়। সুতরাং ওঝাদের মন্ত্র-তন্ত্র ঐ আতঙ্ক থেকে রোগীকে কিছুটা মনের জোর ফেরাতে সাহায্য করে। এছাড়া ওদের কাছে কিছু গাছ-গাছড়ার শেকড়-বাকড় থাকে। যাতে কিছুটা কাজ দেয়। কিন্তু তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ সাধারণ ক্ষেত্রে ওঝারা অজ্ঞ হয় এবং কোন কারণে কোন গাছের কোন পাতা কি কাজ করে তা তারা জানে না। তাই রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে হাসপাতালে দেওয়াই বিধেয়।

মালয়ের পাইথন সবুজ বর্ণের হয়

প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে যেখানে সাপে কেটেছে, তার উপরে ও নীচে ভালো করে বেঁধে দিতে হবে। এর পর ক্ষতস্থানটার চারদিকে চিরে রক্ত বের করে দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপরই যত শীঘ্র সম্ভব হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

হাসপাতালে সকল সময় একপ্রকার অ্যাণ্টিভেনম প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর নাম পলিভ্যালেণ্ট অ্যাণ্টিভেনম। স্বল্প পরিমাণ সাপের বিষ ঘোড়ার শরীরে ঢুকিয়ে দিলে ঘোড়ার রক্তে এক প্রকার অ্যাণ্টিবডি তৈরি হয়। সেই অ্যাণ্টিবডি ঘোড়ার শরীর থেকে নিয়ে এই পলিভ্যালেণ্ট অ্যাণ্টিভেনম তৈরি করা হয়। রোগীর শিরায় এই অ্যাণ্টিভেনমটি সময় মতো ইনজেকশন করে দিলেই প্রায় সমস্ত রোগীই বেঁচে যায়।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতে বছরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (চব্বিশ হাজার থেকে তিরিশ হাজার) লোক মারা যায় এই সাপের কামড়ে। অন্যান্য দেশে এই সংখ্যা খুবই কম। যেমন অষ্ট্রেলিয়াতে বছরে মাত্র সাড়ে চার হাজার মানুষ মারা যায়।

এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গেছে, একমাত্র খালি পায়ে চলা ফেরা করলে এই বিপদ বেশি দেখা দেয়। খালি পায়ে হাঁটলে সন্ধ্যা রাতে স্বল্প প্ররোচনাতে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে (সাধারণত) এই সরীসৃপরা পায়ের কোমল মাংস পেশীতে তাদের বিষাক্ত ছোবল বসায়, এটা ঠিক যে জুতো পরে সাবধানে চলা ফেরা করলে এই মৃত্যুর হার অনেকটা কমানো যেতে পারে।

গ্রাম-বামনসারিষা পোঃ-লালনগর জেলা-মেদিনীপুর পিন-72/424

গোসাপ

যদুপতি মল্লিক

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল গোসাপ সাপ নয়। সাপের সাথে এদের আকৃতির সাদৃশ্য নেই বললেই চলে। সাপের সাথে যে মিল রয়েছে তা জিভে। সাপের মতোই সরু, লকলকে ও চেরা জিভ গোসাপের। এরা সরীসৃপ জাতের প্রাণী। চারটে পা ও একটা লেজ রয়েছে এদের।

কিছু গোসাপ কালো—হলদে রঙের। কিছু গোসাপ আছে যাদের গায়ের রঙ ধূসর। ধূসর রঙের গোসাপেরা থাকে বাড়ির আশপাশে বনে-বাদাড়ে। হলদে-কালো গোসাপদের দেখা যায় জলের কাছাকাছি জায়গায়। ধূসর রঙের গোসাপদের যেমন জলে নামতে দেখা যায় খুব কম, হলদে কালো গোসাপরা তেমনি জলে নামে খুব বেশি। শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হয় বলে তারা অবশ্য জল থেকে ডাঙ্গায় উঠে আসে।

অস্ট্রেলিয়া, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কোমাজে এবং আরো কিছু দ্বীপে এমন গোসাপ রয়েছে যারা লম্বায় 12 ফুটের কাছাকাছি ও ওজনে 3 মনের অধিক। এদের খাদ্য সাপ, ইঁদুর, মরা পাখি, ডিম ইত্যাদি। ডিমের মধ্যে এরা সবচেয়ে বেশি খেতে ভালবাসে কচ্ছপের ডিম। দুটি গোসাপের সামনা সামনি দেখা হলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। একটি গোসাপ আর একটি গোসাপকে দেখে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। বেধে যায় লড়াই। সাপও গোসাপের পরম শত্রু। দেখা পেলে সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ করে।

রামেশ্বরপুর, হুগলি।

সাপের বিষ বিজ্ঞান ঘটক

সাপকে ভয় করে না এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। এই সাপভীতির পিছনে রয়েছে তার ভয়ঙ্কর বিষক্রিয়া, কিন্তু তোমরা শুনলে অবাক হবে সাপের এই বিষ কিন্তু এক প্রকার জটিল প্রোটিন ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে, যে প্রোটিন আমাদের দেহ গঠনের মূল উপাদান সেই প্রোটিনই আবার কি ভয়ঙ্কর বিষরূপই না ধারণ করতে পারে। কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কোন লাভ নেই কারণ আজ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে সাপের বিষ হল স্বচ্ছ এবং ঈষৎপীত বর্ণের দুই বা ততোধিক প্রোটিন মিশ্রিত এক তরল পদার্থ। আম্লিক ধরনের এই বিষ কিন্তু জল ও গ্লিসারলে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়। এই বিষের সঙ্গে যদি সিলভার নাইট্রেট এবং পটাশিয়াম পার-মাঙ্গানেট মিশ্রিত করা যায় তবে বিষের অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করা যায়।

সাপ দংশনের সময় বিষ সাধারণত তাদের ত্বকের নিচে কলার মধ্যে আসে এবং সেখান থেকে সংবহনতন্ত্রে পৌঁছায়। বিষধর সাপের মর্কেক্সলারী দাঁতই রূপান্তরিত হয়ে বিষদাঁতে পরিণত হয়। এবং এই বিষদাঁত যদি কোন ভাবে নষ্ট বা ভেঙ্গে যায় তবে সেই দাঁতের আবার পুনরুৎপত্তি হয়। এই বিষদাঁতটি কিছুটা লাঙ্গলের ফলার মত বাঁকা হয়। এই বিষ দাঁত সাধারণত মুক্ত বা বন্ধ হতে পারে। মুক্ত বিষ দাঁতের ক্ষেত্রে বিষনালী সরাসরি বিষদাঁতে উন্মুক্ত হয়। এই ধরনের বিষ দাঁত দেখা যায় কেউটের ক্ষেত্রে। এবং বন্ধ বিষ দাঁতে বিষনালী বন্ধ থাকে অর্থাৎ বিষনালী বিষ দাঁতের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে। যেমন চন্দ্রবোড়া জাতীয়।

সাধারণত কেউটে জাতীয় এবং চন্দ্রবোড়া জাতীয় সাপের বিষক্রিয়ার মধ্যে প্রভুত পার্থক্য দেখা যায়। যদি বিষধর সাপের দংশনকালে বিষ ত্বকের নীচের কলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তবে সেই অবস্থায় বিষক্রিয়া সাধারণত বিলম্বিত হয়। কিন্তু যদি বিষ সরাসরি শিরায় প্রবেশ করে তবে বিষক্রিয়া দ্রুত হয়।

কেউটে জাতীয় সাপের বিষক্রিয়া সাধারণত দংশনের আধ ঘণ্টার মধ্যে উপসর্গ দেখা যায়, যেমন নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, প্রচুর পরিমাণে লালা ক্ষরিত হয়, জিহ্বা ও স্বর-যন্ত্রের আংশিক পক্ষাঘাত, বমি হওয়া, তারারন্ধ্র সংকোচন ইত্যাদি। রোগীর জ্ঞান অক্ষুন্ন থাকে এবং ধীরে ধীরে শ্বাসক্রিয়া ক্ষীণ হয়ে যায় এবং রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

আবার চন্দ্রবোড়া জাতীয় সাপের দংশনের মাত্র পনের মিনিটের মধ্যেই বিষক্রিয়ার উপসর্গ দেখা যায়। যেমন ক্ষত-

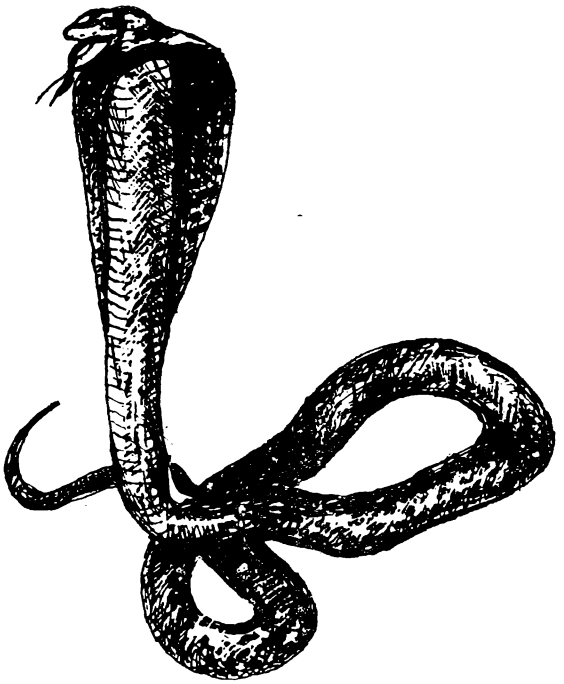

মালয়ের গোখরো

স্থান ফুলে যায় এবং বিবর্ণ হয়ে পড়ে, অসহ্য জ্বালাময় যন্ত্রণা, নাড়ীর গতি বেড়ে যায়, তারারন্ধ্র প্রসারণ হয়, প্রচুর বমি, পায়ু হতে জলীয় পদার্থ বের হতে থাকে, সেই সঙ্গে দৃষ্টি ক্ষীণ হতে থাকে এবং জ্ঞান লোপ পায় এবং অবশেষে মৃত্যু ঘটে।

সাপের নাম শুনলেই আমাদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যায়। আর পথে ঘাটে হঠাৎ কোন সাপকে দেখলেই আমরা ভয়ে আধমরা হয়ে যাই। কিন্তু সব সাপেরই যে বিষ আছে তা কিন্তু নয়, সাধারণত পথে ঘাটে আমরা যে সাপ দেখতে পাই তাদের বেশির ভাগই নির্বিষ। তাই হঠাৎ সাপ দেখেই ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। তোমাদের বিষধর ও নির্বিষ সাপের মধ্যে কিছু তফাৎ বলে দিচ্ছি—তোমরা যদি প্রচণ্ড ভয় না পেয়ে সাপকে একটু লক্ষ্য কর তবেই তোমরা তাদের চিনতে পারবে, যেমন বিষধর সাপেদের গায়ের রঙ চকচকে উজ্জ্বল, মাথার পিছন দিকটা প্রশস্ত, ফণা থাকে, দাঁতগুলি অসমান এবং বিষগ্রন্থী থাকে। অপর পক্ষে নির্বিষ সাপের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের গায়ের রঙ উজ্জ্বল নয়, মাথাটি উপবৃত্তাকার, ফণা অনুপস্থিত, দাঁতের আকার সমান এবং বিষগ্রন্থি থাকে না।

23 বি, নাকতলা লেন, কল-700047।

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

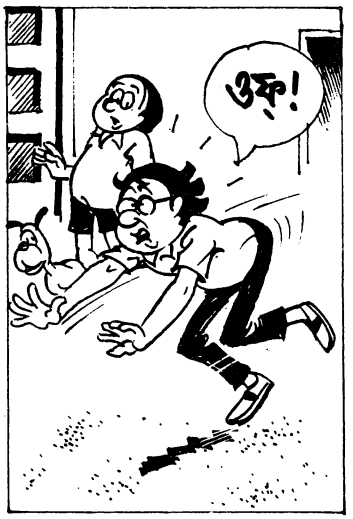

ঘুমনো বার করছি। এ্যাই, উঠ্!
– কে ভাই তোমরা? – দেবদূত? – ওটা অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে – আর একটা জ্বালিয়ে দাও না ভাই।
আমরা যমদূত! ল্যাং মেরে ঢং দেখানো হচ্ছে, জানোয়ার?
মস্তানী হচ্ছে!
দেব মস্তানী ছুটিয়ে–
তোমরা কি মস্তান ভাই? আমার সঙ্গে কি মস্তানী করতে এসেছো? আমি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি ভাই!
এ্যাই খুদে থাম! কেমন একটু গড়বড় মনে হচ্ছে, কোনো নেশাটেশা করেছে! পকেটটা সার্চ কর তো – কোন পরিচয় পত্র আছে কিনা।
সর্বনাশ, এযে দেখছি একরকমের ড্রাগ!
ড্রাগ!
পরিচয় পত্র?
ড্রাগ খেয়ে মাতলামো করছে! পুলিশ জানলে তো ওকে এক্ষুনি এ্যারেস্ট করবে!
ওতে কি আর নেশা কাটবে? এ বড় সাংঘাতিক জিনিস, একবার শুরু করলে যমে না টানলে মুক্তি নেই।

চেনজারাস্!
কিন্তু এ ড্রাগ তো বাজারে ছড়াছড়ি।
এই জন্যেই আরো বিপদ! চরস, হাশিশ, এল এস ডি, ব্রাউন সুগার, ম্যানড্রেক্স, ইত্যাদি হরেকরকম ড্রাগ আছে।
ঠিক বলেছ ভাই, ওঃ, খেলেই মাত!
হেয়ার্ক!
যাঃ, ছেলেটা যে উল্টে গেল মেডকা।
খবরদার, ধরতে যাসনি! নেশাটা একটু ধরে এলেই ও উঠে বসবে।
কিন্তু আবার নেশার সময় হলেই রুদ্রমূর্তি ধরবে। ড্রাগ খাওয়ার পয়সা না থাকলে চুরি ডাকাতি করবে। বাধা দিলে তাকে খুন করতেও দ্বিধা করবে না।
তাহলে সামাজিক অপরাধগুলোর মধ্যে ড্রাগেরও একটা ভূমিকা আছে?
অবশ্যই। ধোঁয়ার সঙ্গে ড্রাগের বিষাক্ত পদার্থ মুসফুসে যায়, সেখানে সহজেই রক্তের সংস্পর্শে আসে এবং দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সৃষ্টি হয় একটা উত্তেজনা, রোমাঞ্চকর অনুভূতি। ব্যাস, ড্রাগের ঐ টুকুই আনন্দ।
তারপর এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। স্নায়ু ও নার্ভগুলিতে অক্সিজেনের অভাব ঘটে, স্বভাবতই মস্তিষ্কও আক্রান্ত হয়।
ক্রমশ দেহের ভারসাম্য হারিয়ে এক রকম পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হয়।
বেচারা, দেখে তো ভদ্রলোকের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে!
হ্যাঁ ভাই। তোমাদেরও তো তাই মালুম হচ্ছে।
ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে জান না? দাও না ভাই এক ছিলিম তৈরী করে। গড্ উইল ব্লেস ইউ।

ড্রাগের নেশা করে যা হাল করেছ, তাতে গডের আশীর্বাদ তোমারই দরকার বৎস !
এবার থেকে এ নেশা ছেড়ে দাও। নইলে—

খ-খবরদার বলছি, মুখ গ-সামলে কথা বলবে ! জানে—তোমাদের মতো অ-অমন দু-দশটাকে পকেটে পুরে ফেলতে পারি।

হতাভাগা !
ইস্, দেহে বিন্দু নেই ! খালি নেশার ঝোঁকে তড়পে যাচ্ছে !
যাঃ, শ-শালুয়া !

দেখ, রাসকেলটা আবার বলে কি !
হাতটা একটু ধ-ধরতো ভাই। ঘুঁসি মেরে থোবনাটা ভেঙে দিই। আ-আমার সঙ্গে ই-ই-ইয়ারকি !

হায় ভগবান, ও তো ওর গধ্যেই নেই ! ও জানে না কোথায় আছে, কি বলছে, কি করছে ! সব বেভুল।

এই বাদার, আ-আমার পকেট থেকে গ-গালগুলো ফেলে দিয়ে আ-আমাকে একটু বাড়ি পৌঁছে দে-দেবে ?
আবার ভুল বকছে !
না—মনে হয় আমাদের কথা শুনে ওর জ্ঞান চক্ষু খুলেছে !

বুঝলি খুদে, আসল কথা হল—যে একবার এ নেশার পরিণতি বুঝতে পেরেছে সে কখনও ও পথে যাবে না।
কারেক্ট !
যাক, বুদ্ধিটা এবার লাস্টিং করলে হয়।

বনসৃজনে ইউক্যালিপটাস

• ছন্দোময় মণ্ডল •

বিংশ শতাব্দীতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিশ্বজুড়ে বনসৃজন কর্মসূচী গড়ে তোলা হয়েছে। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গও এর ব্যতিক্রম নয়। বনসৃজন কর্মসূচীতে যে গাছটিকে শুষ্ক ও রুক্ষ অঞ্চলে লাগানোর জন্যে জোর প্রচেষ্টা ও প্রচার চালানো হচ্ছে, তার নাম ইউক্যালিপটাস। গাছটি বাড়ে খুব তাড়াতে অনুর্বর মাটিতে ও যথেষ্ট অযত্নের মধ্যেও জন্মায়। পশুদের এই গাছ পছন্দ নয় বলে এই গাছের রক্ষ বেশ সহজ। ইউক্যালিপটাসে রোগ পোকার আক্র হয় না বললেই চলে। আবার, অর্থনৈতিক দিক দি গাছ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। কাগজ কাঁচামাল হিসাবে এর ব্যবহার ব্যাপক এবং এর পাত তৈরী তেলের বাণিজ্যিক মূল্যও যথেষ্ট। কাঠ থেবে যায় বাড়ি তৈরীর মশলা। আর জ্বালানী হিসাবে ডালপাতার ব্যবহার তো আছেই।

কিন্তু ইউক্যালিপটাসকে ঘিরে বিতর্কের অবকাশ এ গাছের ফুল বা ফল মানুষের কোনো কাজে লাগে আবার ফুলের পরাগ হাঁপানির কারণ বলে অনেকের ধ এর পাতা গরু-ছাগলের খাদ্য নয় এবং ইউক্যালিপটা ঘাস-পাতাও জন্মায় না। তাই এই বন গরু মহিষ চরা অযোগ্য। আবার কেউ কেউ বলেন যে এই গাছ মাটি প্রচুর জল শুষে নেয়। তাই পাশাপাশি মাটিতে ভাল ফলে না। একদল এমনও বলছেন যে, ইউক্যালিপট জন্য ভূগর্ভের জলস্তর নীচে নেমে যাচ্ছে। ফলে কুয়োর নীচে নামছে, অগভীর নলকূপের জল শুকিয়ে যাচ্ছে, অ আগের মতো জল দিচ্ছে না। শুধু তাই নয়, ইউক্যালি পটাসের জন্য মাটি হয়ে যাচ্ছে অম্ল।

তাই ইউক্যালিপটাস হয়ে উঠেছে বনসৃজনে একটা বিতর্কিত নাম। বনসৃজনে ইউক্যালিপটাস লাগানোর পক্ষে ও বিপক্ষে যাঁরা, তাঁদের উভয়েরই বক্তব্যের সারবত্তা আছে। ইউক্যালিপটাস সত্যিই অন্যান্য বড় গাছের মতো আশে-পাশের জমি থেকে জল টানে। তবে গাছের জলশোষণ ক্ষমতা তার পাতার চেহারা এবং গঠনের উপর নির্ভরশীল। পাতায় থাকে অসংখ্য ছিদ্র যা 'পত্ররন্ধ্র' বা স্টোমাটা (Stomata) নামে পরিচিত। গাছ তার মূল দিয়ে যে জল টানে তার অধিকাংশ এই পত্ররন্ধ্র দিয়ে বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়। যে গাছের পাতা বড়ো পত্ররন্ধ্র সংখ্যায় বেশি এবং অধিক কর্মক্ষম, সে গাছ বেশি পরিমাণে জল বায়ুমণ্ডলে উড়িয়ে দেয়।

ইউক্যালিপটাস শুষ্ক অঞ্চলেরই গাছ। তাই প্রাকৃতিক নিয়মেই এই গাছের পাতা ছোট, সংখ্যায় অল্প এবং পত্ররন্ধ্রও কম। অল্প জল পেলেও এই গাছ তার প্রয়োজন

মিটিয়ে নেয়। কিন্তু এর জলশোষণ করার ক্ষমতা খুব বেশি। সেই কারণেই ইউক্যালিপটাস ভূমির আশেপাশের গাছকে জলকষ্টে ভুগতে হয়। ইউক্যালিপটাস বনে ঘাস না জন্মানোর প্রধান কারণও হল এটা। ইউক্যালিপটাসের শত শত প্রজাতির মধ্যে কয়েকটির জলশোষণ ক্ষমতা এত বেশী যে জলাভূমিকে শুকনো করার কাজে পর্যন্ত এগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে!

কিন্তু তাই বলে ভূগর্ভস্থ জলের নীচে নেমে যাবার কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা যে অতিকথন করেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ যেন 'যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'। ইউক্যালিপটাস গাছ লম্বা। লম্বা গাছের শিকড়ও মাটির একটু বেশী গভীরে নামে। কিন্তু তাই বলে এই গাছের শিকড় এত নীচে নামে না যে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর শুকিয়ে যায় বা নীচে নেমে যায়।

ইউক্যালিপটাসের বনে মাটি যে অম্ল হয়ে যায় তার কারণ আছে। এই গাছের ঝরাপাতা মাটির উপর পুরু হয়ে জমে যায়। এই পাতা পচে যে অম্লত্বের সৃষ্টি হয় তা মাটিতে যাবেই। এ ব্যাপারে যে গাছই লাগানো হোক, ফল একই। তবে সরু পাতাযুক্ত গাছের দায়িত্ব একটু বেশী, পাইন বনের তলা যে পরিষ্কার তার কারণ এর সূঁচের মতো সরু পাতার অধিকতর অম্ল সৃষ্টির ক্ষমতা। যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী সে অঞ্চলে অম্লত্ব বেশী বৃদ্ধি পায়। আবার ইউক্যালিপটাসের বিরুদ্ধে হাঁপানির যে অভিযোগ আনা হয়, তা কি শুধু একা ইউক্যালিপটাসের জন্যই? ইউক্যালিপটাস ছাড়াও এমন বহু গাছ রয়েছে (এবং বনসৃজনের কর্মসূচীতেও তাদের নাম রয়েছে) যারা এই রোগ সম্প্রসারণে সহায়ক।

কিন্তু ইউক্যালিপটাস যে দ্রুত বাড়ে, অল্প সময়ে প্রচুর কাঠ ও পাতা দেয়, ভূমিক্ষয় রোধ করে, মাটি আঁকড়ে রেখে পাহাড়ী এলাকায় ধ্বস নামা প্রতিরোধ করে, সেসব বিষয়ে দ্বি-মত থাকতে পারে না। অন্যান্য গাছের মতো এ গাছও বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) নিয়ে নেয় এবং অক্সিজেন (O_2) বাতাসে ছেড়ে দেয়। আবার হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো ধুলো ও ধোঁয়া টেনে নিয়ে পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর রাখে, কান ঝালাপালা করা শব্দের তীব্রতা কমিয়ে আরাম দেয় সবুজের সমারোহে চোখের ও মনের তৃপ্তি তো আছেই।

ক্রমবর্ধমান জনতার চাপে যখন জঙ্গল ফুরিয়ে আসছে, কাঠ ও বাঁশের দাম নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় গরীব মানুষ ঘরবাড়ী করতে পারছে না রান্নার জ্বালানীর সংকট দেখা দিচ্ছে তখন ইউক্যালিপটাসের মতো দ্রুত বর্ধনশীল গাছের প্রচার ও প্রসার সত্যিই প্রয়োজন।

তবে সব কাজেই স্থান-কাল পাত্র বিবেচনা করে করা উচিত। যেখানে মাটি উর্বরা, সেখানে ইউক্যালিপটাসের পরিবর্তে ফল বা অন্য বৃক্ষ লাগালে লাভ অধিকতর। তাই সমাজভিত্তিক বনসৃজনে এমন গাছ নির্বাচন করা দরকার যা মানুষের উপকারে আসবে, স্থানীয় অধিবাসীদের আকাঙ্খিত হবে সেইসব গাছ এবং মানুষ সেসব রক্ষায় যত্নবান হবে। স্থানীয় মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের, অনভিপ্রেত গাছ লাগিয়ে বনসৃজনের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

বি-15/77 লেক প্লেস, কল্যাণী-741 235, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ

আয়োজিত

বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-মেধা পরীক্ষা

তারিখ: 18 সেপ্টেম্বর, 1988

৪র্থ থেকে ১০ম পর্যন্ত প্রতি শ্রেণীর পৃথক প্রশ্নপত্র

পরিষদ-এর সভাপতি ডঃ অচিন্তকুমার মুখোপাধ্যায় (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ) জানাচ্ছেন, কলিকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় পরীক্ষা কেন্দ্র থাকছে। এই পরীক্ষায় আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলের মাধ্যমে অথবা সরাসরি যোগাযোগ করবে। নিজ নিজ ক্লাশের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী প্রশ্ন থাকবে। বিষয়—অঙ্ক বিজ্ঞান (ভৌত-বিজ্ঞান) ভূগোল (প্রাকৃতিক অংশ) এবং সাধারণ জ্ঞান। ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত 60 নম্বরের ষাটটি ও ৭ম থেকে ১০ম পর্যন্ত 100 নম্বরের একশ'টি প্রশ্ন থাকবে। পরীক্ষার ফি—৪র্থ শ্রেণী 3 টাকা, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী 4 টাকা, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী 5 টাকা এবং ৯ম ও ১০ শ্রেণী 6 টাকা। বিস্তারিত তথ্য ও নিয়মাবলীর জন্য এক টাকার পোস্টাল স্ট্যাম্প সহ অবিলম্বে যোগাযোগ করতে হবে। ফি সহ নাম নথিভুক্ত করার শেষ তারিখ 22 আগস্ট '88। নমুনা হিসাবে গত বছরের উত্তরসহ পুরনো প্রশ্নপত্র পাওয়া যাবে। ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ প্রতি শ্রেণীর দাম 2 টাকা এবং ৭ম থেকে ১০ম প্রতি শ্রেণীর দাম 3 টাকা।

যোগাযোগ: মনোজ দত্ত, যুগ্ম-সম্পাদক

ফোন: 31-2093 জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ, 18B/1C টেমার লেন, কলিকাতা-9

দ্বীপের জন্ম-মৃত্যু

অনিলা দত্ত

পৃথিবীর জন্মের সাক্ষী হিসাবে, কোনও জীবের অস্তিত্ব না থাকলেও, সাক্ষী ছিল সূর্য ও নক্ষত্র জগৎ। সূর্য চ্যুত সদ্যোজাত পৃথিবী তখন উচ্চতাপিত গ্যাসের এক ঘূর্ণায়মান গোলোক। জ্বলন্ত গ্যাস ক্রমশঃ শীতল হতে হতে তরলিত হল। পৃথিবী পরিণত হল গলিত পদার্থে। তখন বিভিন্ন পদার্থ সমূহ তাদের ভরের ক্রম-অনুযায়ী, আপন আপন জায়গা বেছে নিল। সবচেয়ে ভারী আর গলিত লৌহ সমূহ স্থান পেল পৃথিবীর কেন্দ্রে, তাকে ঘিরে রইল অপেক্ষাকৃত ঘন শক্ত ব্যাসাল্ট পাথরের আস্তরণ। তার চারধারে আবার সুকঠিন ব্যাসাল্ট ও গ্রানাইটের আবরণ, অবশ্য ততটা পুরু নয়। পৃথিবীর ওপরে ও সমুদ্রের নিচে বিরাজমান ছিল আপাত-সুপ্ত কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে জাগরণোন্মখ আগ্নেয়গিরি।

সামুদ্রিক সমস্ত দ্বীপই প্রায় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগরের অতলান্তে এমনই এক আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও অগ্ন্যুৎপাতের ক্রমান্বয়িক ফলস্বরূপ লাভাস্তূপ জড় হতে হতে পৌঁছে গেল সমুদ্রের ওপরে। সমুদ্রের তলদেশে এর বিস্তার ছিল প্রায় শত মাইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, আগ্নেয়গিরির চূড়ায় মাত্র দুই শত বঃ মিঃ ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ছোট্ট এক কোণাকৃতি দ্বীপ জন্ম নিল। আরও, হাজার হাজার বছর ধরে, আটলান্টিক মহাসাগরের ঢেউ তার ওপর আছড়িয়ে, কোণাকৃতি দ্বীপকে ক্ষয় করতে করতে, খুব অল্পই জেগে রইল সমুদ্রের জলের ওপর মাথা উঁচিয়ে, যার নাম বহু বিতর্কিত বার্মুডা। স্থলভাগ হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দূরে, সমুদ্রের মাঝমধ্যিখানে দ্বীপগুলির অবস্থা হচ্ছে আজ আছে, কাল নেই। লক্ষ লক্ষ বছরের প্রকৃতির প্রস্তুতিতে আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণজাত ধ্বংসাবশেষ থেকে এগুলির জন্ম। পৃথিবীর গঠনের ইতিহাসে, প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আর ভয়ানক ভূমিকম্পের ফলস্বরূপ পরিশেষে জন্ম নেয় হয়তো এক সর্বাঙ্গসুন্দর দ্বীপ। প্রলয়ের শেষে সৃষ্টি, প্রকৃতির চমকপ্রদ বিস্ময়। পৃথিবী যখন ঠাণ্ডা হচ্ছিল, বহুবিধ সঙ্কোচন প্রসারণের ফলে, সমুদ্রের তলদেশ হয়ে উঠলো এবড়ো-খেবড়ো, অমসৃণ, নানান ফাটল ভরা। এই সমস্ত ফাটলের মুখগুলি সমুদ্রের তলদেশের দুর্বলতম অংশবিশেষ। এগুলির মধ্য দিয়েই আগ্নেয় বিস্ফোরণজাত লাভা সমূহ পৃথিবীর অন্তঃস্থলের অভ্যন্তরস্থ কারাগার হতে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে।

সমুদ্রের নিচেকার এই বিস্ফোরণ ভূপৃষ্ঠের ওপরকার বিস্ফোরণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে লাভা, উত্তপ্ত পাথর, কয়লা, গ্যাস ইত্যাদি উন্মুক্ত বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু সমুদ্রের গভীরে, বিস্ফোরণকে সমুদ্র-সলিলের বিরাট চাপের সঙ্গে যুঝতে হয়। জলের সাঙ্ঘাতিক চাপের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে, বিস্ফোরণ জাত ধ্বংসাবশেষ কোণের আকারে ধীরে ধীরে মাথা তুলতে থাকে। স্তূপাকৃতি লাভার উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে পেতে, এক সময়ে সমুদ্রের জলের ওপরে উঠে পড়ে। আবার তখন তাকে আক্রমণ করে সমুদ্রের ঢেউ। লাভাসমূহ যদি তখনও নরম থাকে, তবে ঢেউ এর আঘাতে আঘাতে ক্ষণিক দ্বীপ জলেই লীন হয়ে যায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি নিচ থেকে নব নব বিস্ফোরণজাত চাপ আসতে থাকে, তবে লাভাসমূহ ঢেউ এর সংঘর্ষে ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠে, দ্বীপের জন্ম দেয়। সমুদ্র গর্ভে তখনও যে সমস্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে, হয়তো বা তারা আগামী দিনের দ্বীপের জনক।

প্রশান্তমহাসাগরের অস্ট্রেলিয়া থেকে দু'হাজার মাইল দূরে ফ্যালকন দ্বীপ ছিল এক আগ্নেয়গিরির চূড়ায়। 1913

সালে, অকস্মাৎ এটি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। তেরো বছর পর, পুনরায় আবির্ভূত হয়, হয়তো পুনঃ বিস্ফোরণেরই কারণে। 1949 থেকে, আবার এর কোনও হদিশ নেই। 1883 খ্রীঃ পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম বিধ্বংসী বিস্ফোরণ ঘটেছিল, যখন ক্রাকাটোয়া দ্বীপ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই দ্বীপের অবস্থান ছিল, সুমাত্রা ও জাভার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ প্রণালীটিতে।

1680 খ্রীঃ দ্বীপটিতে একটি বিস্ফোরণ ঘটে। এর 200 বছর পরে আসে প্রচণ্ড ভূমিকম্প। 1883র 27শে আগস্ট। ক্রাকাটোয়া দ্বীপে Pik Pecbuatan আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণ ঘটে। দ্বীপটির কোণাকৃতি মুখগহ্বর হতে নিঃসৃত হতে থাকে হিস্‌হিস্‌ শব্দের সতর্কবাণী। ক্রমে ক্রমে এটি বিষম গর্জনে পরিণত হল। অত্যধিক বাষ্পীয় চাপে সময়ে সময়ে বয়লার যেমন বিকট শব্দে ফেটে যায়, তার শতগুণ শব্দ হয়েছিল। বিস্ফোরণের ভীষণ শব্দ শোনা গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ থেকে। এমন কি তিন হাজার মাইল দূরে মাদাগাস্কার দ্বীপেও এই ধ্বনি পৌঁছে গেল। ভয়ংকর বিরামবিহীন লাভার উদগীরণ চলল দুই দিন ব্যাপী। কোণাকৃতি মুখগহ্বরের অর্ধেকের বেশি উড়েই গেল। 1400 ফুট উচ্চ দ্বীপটি তলিয়ে গেল সমুদ্র সমতলের সহস্র ফুট নিচে। মাত্র একটি সরু কিনারা ভেসে রইল একদা অস্তিত্বের সাক্ষ্য হিসাবে। সমুদ্রের ঢেউ উঠেছিল একশত ফুট উচ্চতা অবধি। সংকীর্ণ প্রণালীটির তীরবর্তী গ্রামসমূহ সম্পূর্ণ বিধৌত হয়ে গিয়েছিল। পঁয়ত্রিশ হাজারেরও বেশি লোকের মৃত্যু ঘটে। ঢেউ এর ধাক্কা আটলান্টিক মহাসাগর ঘিরে উত্তর মুখে পাড়ি দিয়েছিল ইংলিশ চ্যানেল অবধি। ক্রাকাটোয়ার অন্তঃস্থল বিদীর্ণ করে বিপুল ধূলিরাশি প্রবল বেগে মহাকাশে ছড়িয়ে যাওয়ার কারণে, হারিকেন সুরু হয়েছিল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। মহাধূলির আবরণে সারা পৃথিবীর আকাশে প্রায় এক বৎসর-কালীন সূর্যাস্তে গোধূলির রঙ ছিল রক্তরাঙা। কয়েক সপ্তাহ শুধুই গলিত লাভার উপস্থিতি ছিল। সব কিছু ঠাণ্ডা হবার পর, বিজ্ঞানীরা ক্রাকাটোয়াতে হানা দিয়ে দেখলেন, কোথাও কোনও প্রাণের স্পন্দন নেই। ক্রাকাটোয়ার প্রলয় বিজ্ঞানীদের এক মস্ত সুযোগ এনে দিয়েছিল। দ্বীপে প্রাণের অঙ্কুরোদগম ও ক্রমবিকাশ সম্যক অনুধাবনের জন্য। নয়মাস পরে, এক প্রকৃতি বিশারদ মাত্র একটি মাকড়সার দেখা পান, তাও অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে। এর পর, দীর্ঘ পঁচিশ বছরে, মাত্র এক গোছা ঘাস ছাড়া ক্রাকাটোয়াতে কিছুই জন্মায়নি। পরে যে সমস্ত প্রাণী বসতি গেড়েছে, তার নব্বই শতাংশই ছিল সেই সব প্রজাতির যারা উড়ে উড়ে অথবা সাঁতরে দ্বীপটিতে পৌঁছতে পেরেছে। দেশ মহাদেশ হতে দূরে, সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপগুলিতে, প্রায়শঃই সব অদ্ভুত জীবের দেখা পাওয়া যায়, যেগুলি স্থলভাগে মোটেই নেই। এর কারণ, এই সব দ্বীপে প্রজনন ব্যাপারটা একই প্রজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রাণীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য নিতান্তই সীমিত হওয়ায়, প্রজনন কালে পৃথক পৃথক প্রজাতির প্রাণীও পরস্পরকে সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করে। সেজন্য দ্বীপের প্রাণী গোষ্ঠী বিশিষ্ট ও অনন্য, মহাদেশীয় প্রাণিজগতের সঙ্গে এর সাদৃশ্য কম।

প্রশান্ত মহাসাগরে গালাপাগো দ্বীপপুঞ্জের লাভার মধ্যেই প্রথম তরুণ ডারউইন জীবজগতের জন্ম রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধানে প্রবুদ্ধ হন। পৃথিবীর বুকে প্রাণের সূচনাও দ্বীপ-গুলিতেই প্রথম। আদতে, জন্মের আদিমতম মুহূর্তে, বিচ্ছিন্ন দ্বীপমাত্রেই শুষ্ক, রুক্ষ, প্রাণহীন। আগ্নেয়গিরির খাঁজে খাঁজে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। ধীরে ধীরে প্রাণের সম্ভাবনা দেখা দেয়, প্রাণের অংকুর বাতাসে ভর করে আসে, স্রোতে ভেসে আসে। ভাসমান কাঠ বা গাছপালা আশ্রয় করে, দূর দূরান্ত থেকে কিছু জীব, নবীন দ্বীপে বসতির উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। যখন নদী সাগরে মেশে, নদীর স্রোতে সব সময়েই কিছু গাছপালাও সমুদ্র সলিলে বাহিত হয়। আর, এই সব গাছপালার সওয়ারী হয়েও, কিছু প্রাণী সমুদ্র অভিযান চালায় বা চালাতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের হাজার ফুট উচ্চতাতেও কিছু জীবাণু স্বতঃই চলমান ও বহমান। এই সমস্ত দ্বীপে, মাকড়সার উপস্থিতি অবধারিত। বায়ুমণ্ডলের তিন মাইল উচ্চতাতেও মাকড়সার দেখা পাওয়া যায়। মনে হয়, প্রবল ঝড়ের দাপটাই তাদের এতটা উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। গাছের বীজসমূহও ঝড়ের ঝাপ্টায় প্রায় এক মাইল উচ্চতায় উঠে যেতে পারে। এক ধরনের বিশেষ গুল্ম আছে, যা প্রায় সমস্ত সামুদ্রিক দ্বীপেই পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশেরই বীজের আকর্ষ বা কণ্টক থাকে, যেগুলি পাখির পাখনা বা পালকে সংলগ্ন হয়ে দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে বের হয়। পাখির বিষ্ঠা থেকে ডারউইন একবার বিরাশিটি বিভিন্ন গাছের বীজ বিশ্লিষ্ট করেছিলেন যারা আবার সম্পূর্ণ পৃথক পাঁচটি প্রজাতির অন্তর্গত।

মানুষ পালনার্থে সঙ্গে করে যে সমস্ত পশু দ্বীপে নিয়ে গেছে, তাদের কথা বাদ দিলে একথা প্রায় নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, বিচ্ছিন্ন বিজন দ্বীপগুলিতে স্থলচর স্তন্যপায়ী জীব একেবারেই নেই। একমাত্র বাদুরের দেখা পাওয়া যায়, কারণ তারা উড়তে পারে। আটলান্টিক মহাসাগরে এমনই এক সুদূর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ট্রিসটান জ কুন্‌হা, যার নিকটতম মহাদেশের দূরত্ব দেড় হাজার মাইল। এই দ্বীপে কোনও ভূচর পশু নেই। রয়েছে শুধু ডাঙ্গার পাখি। পোকামাকড় আর ক্ষুদ্রাকৃতি বিভিন্ন ধরনের শামুক।

সমুদ্রের গভীরতম তলদেশও পঞ্চাশ মাইলের অধিক গভীর নয়। আর এই তলদেশের ফাটল থেকেই গোড়াপত্তন ঘটে দ্বীপগুলির।

॥ আট ॥

আবার নিঃসীম নীল সমুদ্রে ভেসে বেড়ানো—শংকর কাকা ও সৃজন কাকা, ম্যাপ, পাথর, পেট্রোলিয়াম আর ডঃ শ্রীবাস্তবকে নিয়ে সারাদিন আলোচনায় ব্যস্ত। কিন্তু আমি সে সব আলোচনায় বিশেষ থাকি না, কারণ এখন আর ওসব আমার ভালো লাগে না। আমার নতুন নেশা শংকরকাকার দূরবীন। এত বড় আর শক্তিশালী দূরবীন আমি আগে কখনো দেখি নি। এখন আমার কাজ দূরবীন চোখে লাগিয়ে ডেক চেয়ারে বসে সমুদ্র আর দূরের দ্বীপগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা। উদ্দেশ্য দূরবীনের চোখে জারোয়া বা অন্য কোন আদিবাসী মানুষদের দেখা যায় কিনা। কিন্তু ওদের বোধহয় এমনই স্বভাব যে ওরা কখনো সমুদ্রতীরের দিকে আসে না। দূরবীন চোখে লাগিয়ে মাঝে মাঝে ভাবতাম যদি কোন বোম্বেটে জাহাজ দেখা যায় সমুদ্রে, তাহলে কী দারুণ জমাটি অ্যাডভেনচারই না হবে। হুবহু ডিকেটিভ বইয়ের মতো। কিন্তু না, সেদিক থেকে আমার কপাল একেবারেই মন্দ। সুতরাং জাহাজে খাওয়া দাওয়া ঘুম—এ ছাড়া যেন আর কোন কাজই ছিল না। অবশ্য মাঝে মাঝে টমাস আর আমি মাছ ধরতাম। কখনো পমফ্রেট, ভেটকি কিংবা জাল দিয়ে হেরিং বা সার্ডিন। সামুদ্রিক মাছে কেমন একটা আঁশটে গন্ধ। খেতাম, কিন্তু স্বাদ পেতাম না।

সেদিন সকালে ছেবরই কথাটা তুলল, 'এই বাদল, আজ সমুদ্রে চান করবে?' ছেবরের কথা শুনে আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম—'এই গভীর সমুদ্রে? জলে নামা মাত্রই তো টুপ করে ডুবে যাব—

আমার ভয় পাওয়া দেখে ছেবর হেসে ফেলল, 'গভীর সমুদ্রে কেন? ঐ দেখ না—' আঙুল তুলে ছেবর আমাকে দেখাল। ছেবরের আঙুল বরাবর তাকিয়ে দেখলাম, বেশ খানিকটা দূরে সমুদ্রের মধ্যে সবুজ টিপির মতো ছোট্ট দ্বীপ।

'ছোট্ট দ্বীপটা দেখেছ? ওরই কাছাকাছি জাহাজটা ভিড়িয়ে নৌকো নামিয়ে তীরে যাব। তারপর সেখানে চান সাঁতার সবই হবে—'

'কিন্তু ওখানে যদি জারোয়ারা—'

'আরে না না। ওটা তো ছোট্ট দ্বীপ। ওখানে জারোয়া কেন, কোন লোকই নেই। দেখ, দূরবীনে চোখ লাগিয়ে দেখ—'

চোখে দূরবীন লাগাতেই দ্বীপটা যেন দৌড়ে চলে এলো আমাদের জাহাজের কাছে। দেখলাম, ছোট্ট গোলাকার দ্বীপ, দ্বীপটার ব্যাস এককিলোমিটারও হবে কিনা সন্দেহ। দু'চারটে গাছ, চান করবার মতো গড়ানে সমুদ্র সৈকত আছে। চান করতে কিংবা সাঁতার কাটতে কোন অসুবিধে হবে না।

দূরবীন চোখ থেকে নামিয়ে বললাম, 'আমি রাজি। এখন শুধু কাকাদের রাজি করতে পারলেই হলো।'

অবশ্য সাঁতার কাটবার প্ল্যানের কথা বলামাত্র কাকারা রাজি হয়ে গেলেন।

শংকরকাকা বললেন, প্ল্যানটা ভালোই। জাহাজে বেশ কয়েকদিন ঘুরে ঘুরে একঘেয়ে লাগছে। সমুদ্রে চান করলে মনটা আবার চাঙা হয়ে উঠবে। কি বলিস সৃজন!'

দূর থেকে যত ছোট মনে হয়েছিল, দ্বীপটা কিন্তু তত ছোট নয়। গোলাকার এই দ্বীপের ব্যাস এক কিলোমিটারের চেয়ে হয়তো কিছুটা কম। মাঝখানে একটা লেকও রয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে সৃজনকাকা বললেন, আরে এটা দেখছি একটা অ্যাটল—'

জিজ্ঞেস করলাম, 'মানে—'

ভূগোল মাস্টারের ভঙ্গীতে জবাব দিলেন কাকা, ভূগোল বইতে পড়িস নি, অ্যাটল হচ্ছে এক ধরনের বৃত্তাকার প্রবাল দ্বীপ, যার মাঝখানে থাকে হ্রদ।'

কাকার কথা শুনে মনে পড়ল ভূগোল বইয়ের ছবির কথা। নারকেল গাছে ঘেরা প্রবাল দ্বীপ, মাঝখানে লেক। বইয়ের

ছবির সঙ্গে কেমন মিলে যাচ্ছে এই দ্বীপের চেহারা। শুধু নারকেল গাছ নয়, আরো অনেক গাছ গাছালি আছে এই দ্বীপে। রয়েছে কিছু পাখি, রঙিন প্রজাপতি। তবে কোন জীবজন্তু চোখে পড়ল না। আমি সৃজনকাকা আর শংকরকাকা দ্বীপের মধ্যে পায়ে হেঁটে চক্কর দিচ্ছিলাম। ওদিকে সমুদ্রের জলে চান করবার আয়োজন করছে ছেবর আর সুভাষ। আর জাহাজে রয়েছে টমাস।

হ্রদের নীল জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললাম, 'প্রশান্ত মহাসাগরের বিকিনি অ্যাটলেই তো আমেরিকা একবার পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা করেছিল, তাই না সৃজনকাকা ?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। আসলে কোন লোকজন ছিল না বলে দ্বীপটাকেই বেছে নিয়েছিল ওরা—'

কথা বলতে বলতে দ্বীপটাকে এক চক্কর দিয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছি। ঘড়ি মিলিয়ে দেখলাম সময় বেশি লাগে নি। মাত্র এক ঘণ্টা। ইতিমধ্যে অবশ্য ছেবর আর সুভাষ সব গুছিয়ে রেখেছে। সমুদ্রের ধারে নারকেল গাছের তলায় সতরঞ্চি বিছিয়েছে। তার ওপর গা মোছবার তোয়ালে। সুইমিং ট্রাংক, রবারের গোল চাকা, গায়ে ও মাথায় মাখবার তেল, চিরুনি সবকিছু পরপর সাজানো। জলতেষ্টা মেটাবার জন্য গাছ থেকে পেড়ে রেখেছে অন্তত গোটা দশেক ডাব। সবকিছু সাজানো গোছানো দেখে আমাদের সকলের মনমেজাজও খুব ভালো।

হাতের বন্দুকটা সতরঞ্চির ওপর রেখে শংকরকাকা বললেন, 'এটা শুধুশুধুই বয়ে নিয়ে এলাম। কোন কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।'

সৃজনকাকা অন্যমনস্কভাবে বললেন, বন্দুকটা থাকলে ক্ষতি কি ? এতে বরং আত্মবিশ্বাস বাড়ে। কি বলিস বাদল ?'

সৃজনকাকার কথার উত্তরে কিছু বলবার আগেই ছেবর একটা ডাব কেটে দিল আমার হাতে। প্রায় দু-আড়াই কিলোমিটার হেঁটে সত্যিই একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ছেবরের দেওয়া ডাবের মিস্টি জল খেয়ে আমাদের সকলের তেষ্টা মিটল। সামনের সমুদ্র-সৈকত ছোট হলেও এর সৌন্দর্য আমার মন কাড়ল। পুরী কিংবা দীঘার সমুদ্র কেমন নোংরা। কিন্তু এই নাম-না-জানা প্রবালদ্বীপের চারপাশে ফিরোজা নীল সমুদ্র। দুধের মতো শাদা ফেনা।

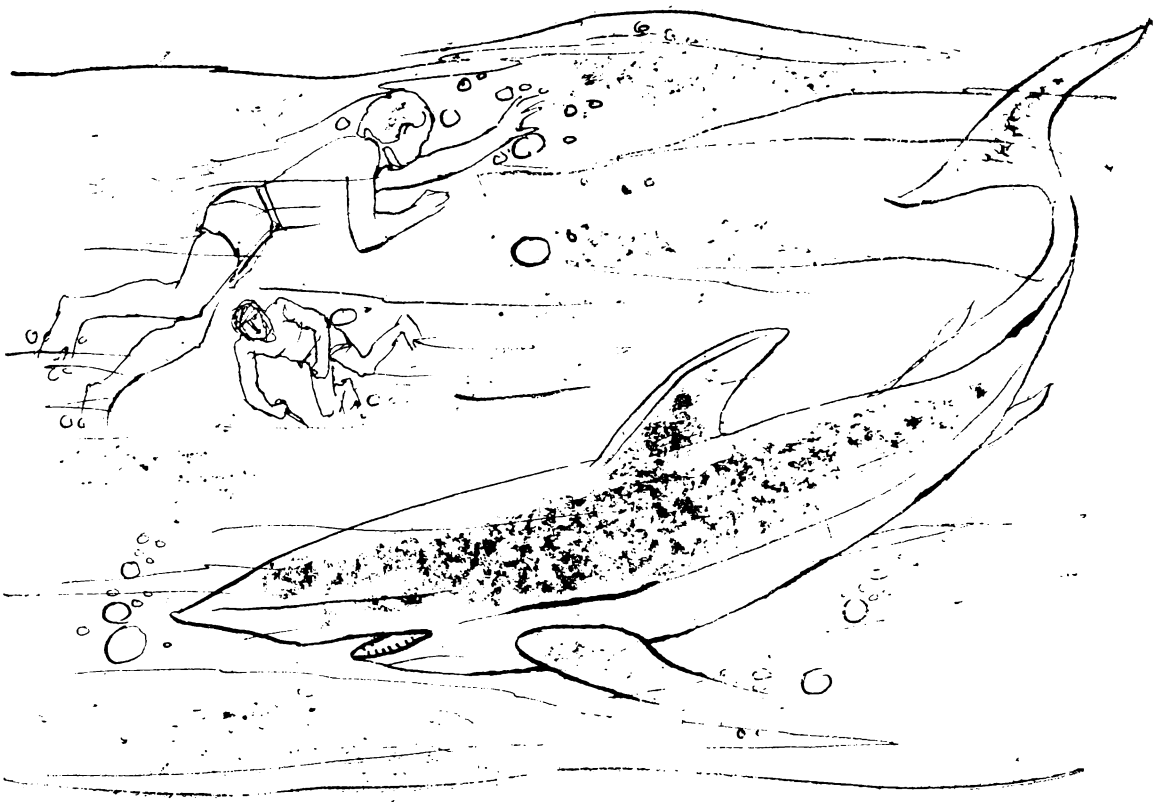

বাদল পাড়ের দিকে সাঁতার কেটে এগিয়ে যাও···

আকাশে দু-চারটে গাংচিল উড়ছে। সব মিলিয়ে এক অপূর্ব পরিবেশ। এর সমুদ্রের ঢেউ আমাদের পায়ের কাছে বারবার লুটিয়ে পড়ে আমাদের যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

সুইমিং ট্রাংক পড়ে আমরা সবাই যখন জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, তখন সমস্ত শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে জুড়িয়ে গেল। শরীরের সব ক্লান্তি উধাও এক নিমেষে।

ওপাশটায় শংকরকাকা আর সৃজনকাকা সাঁতার কাটছিলেন। এপাশে আমরা তিনজন—ছেবর আমি আর সুভাষ। ছেবরদা আর সুভাষ সাঁতার কাটতে ওস্তাদ। আমিও সাঁতার ভালোই জানি, তবে সমুদ্রে সাঁতার কাটবার অভিজ্ঞতা আমার কম। তাই সঙ্গে ফোলা রবারের গোল চাকা নিয়েছি। সাঁতার কাটতে কাটতে ছেবর আর সুভাষ গভীর সমুদ্রে চলে গিয়েছিল। ওদের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে আমিও চলে গিয়েছি গভীর সমুদ্রে। বিরাট বিরাট ঢেউ ছুটে আসছে বিরাট হাঁ করে, আর আমি রবারের গোল চাকায় ভর করে ভেসে উঠছি ঢেউয়ের মাথায়। সাঁতার কাটতে যে এমন মজা তা' কি আগে কখনো টের পেয়েছি ; প্রায় একতলা বাড়ির সমান উঁচু ঢেউয়ের মাথার ওপর থেকে নজর পড়ছিল, সৃজনকাকা আর শংকরকাকা পাড়ের কাছেই অল্প জলে চান করতে করতে গল্প করছেন। ওদের চান করা দেখে আমি মনে মনে ভাবছিলাম, কাকারা কী বোকা! এমন উত্তাল ঢেউয়ের মাথায় চান করতে কতই না মজা!

হঠাৎ পায়ের কাছে ডাঙার মতো কী যেন ঠেকল। কী ব্যাপার,এখানে আবার ডাঙা এলো কী করে! তবে কি সাঁতার কাটতে কাটতে আবার চলে এসেছি পাড়ের কাছে?

কিছু বোঝবার আগেই ওপাশ থেকে ছেবরদা চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঙর, হাঙর। বাদল পাড়ের দিকে সাঁতার কেটে এগিয়ে যাও—'

ছেবরের কথা শেষ হবার আগেই যেন মনে হলো, আমার কাছে ফিট দশেকের কী একটা জন্তু। কালো চেহারা বিরাট হাঁ করা মুখে অনেকগুলো সারি সারি দাঁত। ঐ দৃশ্য দেখে মনে হলো, আমার হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হয়ে যাবে।

ছেবর চিৎকার করে কী যেন বলল, শুনতে পেলাম না। মনে হলো, কে যেন বিরাট হাঁ করে গিলে ফেলছে আমাকে। তারপর আর আমার কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরতেই দেখি, সমুদ্রতীরে নারকেল গাছের তলায় সতরঞ্জির উপর শুয়ে আছি। আমার শরীর জুড়ে অসহ্য ব্যথা। আমাকে ঘিরে চিন্তিত মুখে বসে আছেন সকলে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে আমার?'

হাতজোড় করে আকাশের দিকে নমস্কার করে ছেবর বলল, 'কিছুই হয় নি। বরং জিজ্ঞেস করো, কী হতে পারত?'

সৃজনকাকা বললেন, 'ওঃ খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছিস। ছেবর না থাকলে হাঙরের পেটেই যেতে হতো আজ।'

দেবরের দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকালাম। দেখলাম ও আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর মুখ থেকে তখনো উদ্বেগের ভাবটা মুছে যায় নি।

সৃজনকাকা বলে চলে, 'ছেবরের চিৎকার শুনে আমরা তাকিয়ে দেখি, তোর থেকে মাত্র হাত আষ্টেক দূরে একটা হাঙর, আর তুই ঢেউয়ের ধাক্কায় জলের নিচে চলে যাচ্ছিস। ঐ দৃশ্য দেখে আমরা তো হতভম্ব। তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে শংকর ছুটল বন্দুক আনতে। এদিকে হাঙরটা তোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ছেবরের হাতের ছোরা বিঁধল গিয়ে একেবারে হাঙরের মুখের ভেতরে, একেবারে মোক্ষম টিপ। ছোরা খেয়ে সেই যে হাঙরটা ডুব দিল, তার আর দেখা পাই নি—'

এবার উঠে বসে আমি মুচকি হাসলাম, 'দেবরদা, তোমার এত সুন্দর ছোরাটা তো গেল। এর পরের বার বাঁচাবে কী করে?'

আমার কথা শুনে সকলে হাসল। বুঝল, আমার বিপদ কেটে গেছে।

সৃজনকাকা বললেন, 'ভাগ্যিস তুমি ছোরাটা রেখেছিলে—'

'আমি যেখানেই যাই না কেন, সব সময়ই আমার কোমরে ছোরাটা গোঁজা থাকে। তবে আমার ছোরা না থাকলে দাশগুপ্ত সাহেবই গুলি করে হাঙরটাকে মেরে ফেলতেন।'

শংকরকাকা লাজুকস্বরে বললেন, 'না হে ছেবর, এমন অবস্থায় আগে তো কখনো পড়ি নি। তাই ঐ দৃশ্য দেখে আমার হাত কাঁপছিল, ঠিকঠাক হাঙরটাকে গুলি করতে পারতাম কিনা সন্দেহ।'

(চলবে)

১ টাকাও আপনার ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর টিকিট কিনুন

সাপ্তাহিক পুরস্কারের নতুন প্রকল্প
৬৩৭ তম খেলা থেকে প্রযোজ্য
খেলা কেবলমাত্র বিক্রিত টিকিটে

১ টাকার বিনিময়ে সপ্তাহের
প্রতি বুধবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী
আপনাকে দিচ্ছে প্রথম পুরস্কার

১,৫০,০০০ টাকা

প্রথম পুরস্কারে এজেন্ট পাবেন ৬০০০, বিক্রেতার ২৫০০

প্রথম পুরস্কার ছাড়া সান্ত্বনা পুরস্কার ২টি প্রতিটি ১০০০,
এজেন্টের পুরস্কার ১০০, বিক্রেতার ১০০,

দ্বিতীয় পুরস্কার ৬টি, প্রতি সিরিজে ২টি প্রতিটি ৫০০০,
এজেন্টের পুরস্কার ৬০০, বিক্রেতার ২৫০,

তৃতীয় পুরস্কার ১৫০টি, প্রতিটি ৫০০,
এজেন্টের পুরস্কার ১০০, বিক্রেতার ১০০,

চতুর্থ পুরস্কার ১৫০০টি, প্রতিটি ৫০,
এজেন্টের পুরস্কার ২০, বিক্রেতার ২০,

পঞ্চম পুরস্কার ১৫০০টি, প্রতিটি ২০,
এজেন্টের পুরস্কার ১০, বিক্রেতার ১০,

ষষ্ঠ পুরস্কার ১৫০০০টি, প্রতিটি ১০,
বিক্রেতার পুরস্কার ৫,

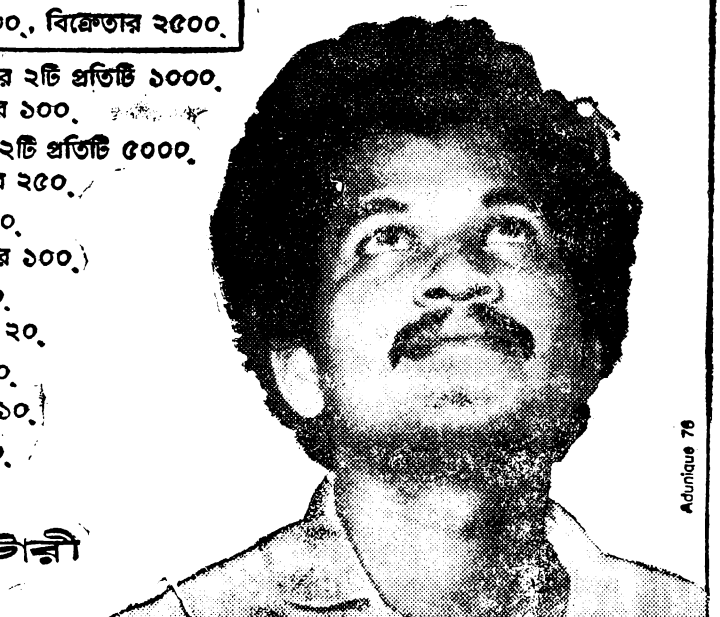

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী
(সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়ন্ত্রিত)
৬৯ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা-৭০০ ০১৩
ফোন : ২৬ ৪৬৮৮/২৬ ৪৬৮৯

গ্রহকণ্ঠ

পরিচয় গুপ্ত

প্রখ্যাত মহাকাশ বিজ্ঞানী ডঃ বিজয়কেতু গুপ্ত সারা আমেরিকা তোলপাড় করে যেদিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন, সেইদিনই দলে দলে সাংবাদিক তাঁর চেতলাস্থিত বাসভবনে ভীড় করল।

সকলেই তাঁর মহাকাশ সংক্রান্ত অভিনব গবেষণার বিষয়টি সর্বাগ্রে তাদের পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চায়।

ডঃ গুপ্ত তাঁর বৈঠকখানায় বসে খোশমেজাজে পাইপ টানছিলেন। এদিকে তাঁর ফেরার খবর রেডিও মারফৎ প্রচারিত হওয়ায়, ফোনও বেজে উঠছিল ঘন ঘন। তিনি অবশ্য কোন ধরছিলেন না। সহকারী ত্রিভুবনই নামধাম আর অ্যাপয়েন্টমেণ্ট টাইম নোট করে রাখছিল। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে রিসিভার তুলে দিচ্ছিল ডঃ গুপ্তের হাতে।

এদিকে সাংবাদিকরা সাগ্রহেই অপেক্ষা করছিল তাঁর সাক্ষাৎকারটি নেবার জন্য।

মিঃ গুপ্ত ইতিমধ্যেই নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন তাদের যথোপযুক্ত আদর আপ্যায়নের জন্য। যথাসময়েই মিষ্টি, চানাচুর ও কফি এসে হাজির হল টেবিলে।

ডঃ গুপ্ত তাদের সাদর আহ্বান জানাতে, খুশীর হাওয়া বয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

* * * * *

সাংবাদিক মনোজ দে-ই প্রথম প্রশ্ন করল। বললে, মহাকাশ নিয়ে আপনি যে যুগান্তর সৃষ্টিকারী গবেষণা কাজে ব্রতী হয়েছেন, তার খবর আমরা আমেরিকান সায়েন্স জার্নাল মারফৎই জানতে পেরেছি। আমরা সাগ্রহেই অপেক্ষা করছিলাম আপনার জন্য। এ কথা গোপন করে লাভ নেই যে আপনি যেহেতু ভারতীয় এ গৌরব আমাদের সকলেরই।

এখন আমার প্রশ্ন আপনার পরিকল্পনা সার্থক হলে বিশ্বমানবের কী উপকার হবে?

ডঃ গুপ্ত সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে মৃদু হাসলেন। চোখ থেকে পুরু লেন্সের চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে পুঁছতে লাগলেন।

সকলেই সাগ্রহে তাকিয়েছিল তাঁর মুখের দিকে। আলোড়ন সৃষ্টিকারী ডঃ গুপ্তের প্রশস্ত ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চক-চকে দুটো চোখে প্রতিভার ছাপ। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও বেশভূষা দেখে বোঝার উপায় নেই তিনি একজন খাশ ভারতীয়।

শূন্যে একরাশ সিগারের ধোঁয়া ছড়িয়ে ডঃ গুপ্ত বললেন, আপনারা সকলেই জানেন যেদিন গ্রহান্তরে মানুষের প্রথম অভিযান শুরু হয়েছিল সেদিন সকলেই আশা করেছিল এ অভিযান সম্পুর্ণ মানুষের কল্যাণে। তাই একবাক্যে সকলে মানুষের এই শুভ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে দেখা যাচ্ছে মহাকাশ জয়ের পিছনেও মানুষের অশুভ অভিসন্ধি আছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করার চক্রান্ত চলছে অর্থাৎ মানুষই পৃথিবী ধ্বংস করে মানুষের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে চায়।

এই অপচেষ্টাকে রুখতেই আমার গবেষণার সূচনা। ডঃ গুপ্ত নীরবে পাইপে টান দিলেন। সাময়িক একটা নীরবতা হল ঘরটিকে গ্রাস করল।

উপস্থিত সাংবাদিকরা সকলেই সকৌতুহলে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে।

ডঃ গুপ্ত পাইপটা ঠোঁটের কোনায় ঠেলে দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, একজ্যাক্‌টলি। আমি চাই এই মহাকাশ যুদ্ধ পরিকল্পনা বাতিল হোক। তার পরিবর্তে সারা পৃথিবী জুড়ে যে কুখ্যাত অপরাধীরা আছে তাদেরকে নির্বাসিত করা হোক এই সব গ্রহ উপগ্রহে। কেবলমাত্র বেঁচে থাকার রসদ-টুকুই বিজ্ঞানীরা রেখে আসবেন তাদের সঙ্গে। যাতে তাদের বাঁচার পথে কোনও অন্তরায় না হয়।

এইভাবে অপরাধপ্রবণ মানুষকে শান্তিপ্রিয় মনুষ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে, একদিন না একদিন পৃথিবী অপরাধ শূন্য হয়ে পড়তে বাধ্য।

ডঃ গুপ্ত তাঁর বক্তব্য শেষ করা মাত্রই, সাংবাদিক অনীশ চৌধুরী প্রশ্ন করল, কিন্তু এজন্য অপরাধীদের উপগ্রহে চালান করার প্রয়োজন কি। এ কাজটা তো পৃথিবীর মাটিতেও হতে পারে। যেমন বৃটিশ আমলে আন্দামানে নির্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

না-না-না-না তা হয় না। পৃথিবীতে যে অঞ্চলেই রাখা হোক না কেন তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারীর জন্য কিছু সুস্থ মানুষকে তো পাশে রাখতেই হবে। আর তা থেকেই এই অপরাধের সংক্রমন ঘটবে।

এই দেখুন না। যেমন চার্লস শোভরাজ। অপরাধ-প্রবন শোভরাজকে জেলখানা থেকে পালাতে যারা সাহায্য করেছিল তারা কেউই কিন্তু অপরাধী ছিল না।

শোভরাজের ব্যক্তিগত প্রভাবই তাদের অপরাধী করে তুলেছিল। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে একজন অপরাধী সহস্র অপরাধীর জন্ম দেয়।

ডঃ অকস্মাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। জানালার দিকে তাকিয়ে বিড় :বিড় করে বললেন, এ বিষয়ে গবেষণা অনেক ফলপ্রসূ।

শুধু আমেরিকাই নয়, সারা বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীরাই আমার গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। অবশ্য গবেষণা আমার এখনও শেষ হয়নি।

দেখছি আরও কিছু তথ্য যদি সংযোজিত করতে পারি।

আমার এই পরিকল্পনা যদি বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি পায় —সেদিন আপনাদের আমার বাড়ীতে ভূরিভোজের আমন্ত্রণ রইল বলে ডঃ গুপ্ত উচ্চৈস্বরে হাসতে লাগলেন।

সাংবাদিকেরা নোটস্ নেওয়া শেষ করে, একে একে চলে গেল। ডঃ গুপ্ত নীরবে বসে রইলেন তাঁর চেয়ারে।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন গন্যমান্য লোক দেখা করতে এলেন তাঁর সঙ্গে। তবে সেটা নিছকই সৌজন্যমূলক। তা নিয়ে আর আলোচনা বিশেষ গড়ায়নি। এই ভাবেই দেখা-সাক্ষাতের মধ্যে দিয়েই কেটে গেল দিনটা। রাতের ডিনার শেষ করে ডাঃ গুপ্ত ঢুকলেন তাঁর বেডরুমে।

বেডরুমটির সর্বত্র আধুনিকতার ছাপ। ঘরে পূর্বমুখী একটিমাত্রই জানালা। জানালার ভিতর দিয়ে তারকাখচিত নয়নাভিরাম নীলাকাশ দেখা যাচ্ছে।

সামনেই টেবিলে একটা প্লাষ্টিকের জ্যাকট মোড়া ফাইল। ফাইলের ওপরে ডঃ বিজয়কেতুর গুপ্তের নাম স্বর্ণাক্ষরে জ্বল্-জ্বল্ করছে।

ডঃ গুপ্ত টেবিলের সুমুখে বসলেন। আকাশ নিয়েই তাঁর গবেষণা—

আকাশ দেখতে তাঁর স্বভাবতই ভাল লাগে।

দুমিনিট নিষ্পলক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ফাইল খুলে কি যেন লিখতে শুরু করলেন।

লিখতে লিখতে বেশ রাত হয়ে গেল। খোলা জানালা দিয়ে তখন ফুরফুরে বাতাস আসছে।

'নো মোর' স্বগতোক্তি করলেন ডঃ গুপ্ত। তাঁর পরিবারের লোকেরাও সম্ভবতঃ কেউ আর জেগে নেই। চারপাশেই জমাট বাধা নিস্তব্ধতা।

নাইট ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন তাঁর বিছানায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারাদিনের ক্লান্তি নেমে এল তাঁর দু'চোখ জুড়ে।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই অবাক কাণ্ড। টেবিলের ওপর তাঁর গবেষণা সংক্রান্ত লেখাপত্র সমেত ফাইলটা নেই। যেন কোনও যাদুকরের যাদুকাঠি স্পর্শে আকস্মিক অন্তর্হিত হয়েছে।

অবিশ্বাস্য ঘটনা। তিনি দুহাতে চোখ রগড়ে আবার তাকালেন সেদিকে। নাঃ সত্যি সত্যিই টেবিল থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। অথচ দরজা যথারীতিই বন্ধ রয়েছে ভিতর থেকে।

ডঃ গুপ্ত প্রায় লাফ মেরেই নেমে এলেন খাট থেকে। সম্ভাব্য সকল জায়গাতেই তিনি অনুসন্ধান চালালেন। না কোথাও তার হদিস মিলল না। এদিকে ঘরের মধ্যে জিনিসপত্তর ওলটপালটের শব্দ শুনে ছুটে এল তাঁর পরিবারের লোকেরা। তারা দরজা খোলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

তিনি খিল খুললেন না। ফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে সরাসরি স্থানীয় থানার ওসি মনীষ চ্যাটার্জীকে ফোন করলেন। তিনি থানায় উপস্থিত ছিলেন। সবশুনে বললেন, ঠিকই করেছেন। ঘরে কাউকে ঢুকতে দেবেন না। আমি এখুনি যাচ্ছি।

তিনি ফোন শেষ করেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন চেয়ারে। প্রকৃত ঘটনাটা কি জানার জন্য তখন অনেকেই দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যেই ও. সি এসে হাজির হলেন ফোর্স নিয়ে। পরিচয় প্রকাশ করে দরজায় করাঘাত করতেই ডঃ গুপ্ত দরজা খুলে দিলেন।

ঘটনাটা খুবই মন দিয়ে শুনলেন তিনি। বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, ভোর রাত্তিরেই চুরি হয়েছে মনে হচ্ছে। রাতে পুলিশ তো যথারীতিই পথে টহল দিয়েছে। তাদের চোখে ফাঁকি দিয়েই তাহলে নিয়ে গেল। স্ট্রেঞ্জ থিং! মনীষ চ্যাটার্জী ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন জানলার দিকে। এবং জানালা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিলেন। পরিস্কার দেয়াল। বেয়ে ওঠার মত কিছুই নেই। নীচে একটা ছোটখাট ফুলের বাগান। বেশ কিছু ফুলও ফুটেছে সেখানে।

কীভাবে অপরাধী এ পথে ওপরে উঠতে পারে তার মাথায় এল না। যে জন্য তার মুখে চিন্তার ছাপ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। ডঃ গুপ্তকে ঘরে অপেক্ষা করতে বলে তিনি বাইরে থেকে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করার জন্য সোজা গিয়ে হাজির হলেন বাগানে। সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন বটে, কিন্তু রহস্যের কোনও কিনারা হল না। অগত্যা তিনি ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্টের সাহায্য নিতে মনস্থ করলেন।

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ অনল অধিকারী ফোনেই ঘটনাটা শুনে কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, খুবই ইণ্টারেস্টিং কেস মনে হচ্ছে। আমি যাচ্ছি। দেখবেন কেউ যেন কিছু না স্পর্শ করে।

মিঃ অধিকারী এসে গভীর মনোযোগের সঙ্গেই অপরাধী কোনও সূত্র রেখে গিয়েছে কিনা তার অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। বাগানের মাটি ও টেবিলের ধূলোর ওপর থেকে কিছু কিছু ছাপ তুললেন বটে কিন্তু তেমন খুশী হতে পারলেন না। কোনটিই স্পষ্ট নয় বা ইঙ্গিতবহ নয়। তা থেকে আদৌ কোনও সূত্র মিলবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ ছিল।

জানালার কাছ থেকে ফিরে আসার মুহূর্তে হঠাৎ তার জানালার বাইরে কংক্রীটটার ওপরে মেটে রঙের একটা বস্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি ঝুঁকে পড়লেন তার ওপর এবং সযত্নে সেটা তুলে নিয়ে ল্যাবরেটরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

* * *

সাত সকালে বিছানায় শুয়ে চা খেতে খেতে কাগজ পড়া তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস।

কাগজের প্রথম পাতাতেই একটা বক্স নিউজ। সংক্ষেপে নিউজটা হল—ভারতের পূর্বাকাশে মধ্যরাতে একটা উড়ন্ত পিরিচের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। বিপ্ বিপ্ অস্পষ্ট ধ্বনিতে দ্রুতবেগেই ভারতের আকাশ অতিক্রম করে অন্ধকারে তা মিলিয়ে যায়। ইত্যাদি।

ডঃ গুপ্ত ভ্রু কোঁচকালেন। উড়ন্ত পিরিচ আবার কোত্থেকে এল!

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্ট থেকে মিঃ অধিকারী ফোন করেছেন। তিনি প্রতীক্ষায় ছিলেন। সাগ্রহে রিসিভার তুলতেই তিনি বললেন, ডঃ গুপ্ত যে বস্তুটি আপনার জানালা থেকে পেয়েছি তা শুধু মূল্যবানই নয় দুর্লভও বটে।

এর মধ্যে মাটির উপাদান থাকলেও পৃথিবীতে এর অস্তিত্ব মেলে না। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত গ্রহের যে মাটির নমুনা আমাদের মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে তার সঙ্গে কিছুটা মিল আছে।

অবশ্য কেমন করেই বা তা সম্ভব। এখানে এ জিনিস এলোই বা কি করে।

একমাত্র দুষ্কৃতিকারী জানালা দিয়ে ফাইলটি সরাবার মুহূর্তে যদি এই পদচিহ্ন ফেলে গিয়ে থাকে।

যাহোক, দেখছি এ থেকে কোনও সূত্র মেলে কিনা। আপনি চিন্তা করবেন না। তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন।

একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সারাদিনটা কেটে গেল ডঃ বিজয়কেতু গুপ্তের এক ফুৎকারে যেন হঠাৎ একটা জ্বলন্ত সূর্য নিভে গিয়েছে।

টেবিলের ওপর মাথা রেখে ভাবতে ভাবতে কখন যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন খেয়াল নেই। হঠাৎ তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন। উড়ন্ত পিরিচের সেই বিপ্-বিপ্ শব্দ।

সেই সঙ্গে একটা ক্ষীণ অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর..."না-না গ্রহান্তরের মাটি আমরা পৃথিবীর পাপে কলুষিত হতে দেব না!"

তিনি ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলেন। এ কার কণ্ঠস্বর? কে-কে-কে-কে...

জানালা ভেদ করে শূন্যে দৃষ্টি মেলতেই দেখলেন খালি জমাট বাধা অন্ধকার!

4/1/2এ, রাধাপ্রসাদ লেন, কলি-9

আপনিই পারেন আগুন ঠেকাতে

অবজ্ঞা আর অবহেলা থেকে আগুন লাগতে পারে। কয়েকটি ব্যাপারে একটু সতর্ক হলেই কিন্তু বিপদ এড়ানো যায়।

* লক্ষ্য রাখবেন বাড়ির বিজলী তারে যেন কোনও খুঁত না থাকে। কাছাকাছি দমকল অফিসের টেলিফোন নম্বর জেনে রাখবেন।
* সিগারেট বা দেশলাই ফেলবার আগে নিভিয়ে দিন।
* বিছানায় ধূমপান করবেন না।
* অস্থায়ী মণ্ডপে বিদ্যুতের কাজে সতকর্তামূলক নিয়ম মেনে চলুন।
* পেট্রোল বা অন্য কোনও সহজদাহ্য পদার্থ বাড়িতে রাখবেন না।
* আগুন লাগলে আতঙ্কিত হবেন না। বিচলিত না হয়ে অবিলম্বে টেলিফোনে অথবা লোক পাঠিয়ে দমকলকে খবর দিন। ঘটনাস্থলের সঠিক অবস্থান এবং আপনার টেলিফোন নম্বর জানাতে ভুলবেন না।
* দমকল বাহিনীর প্রয়োজন ও পরামর্শমত তাদের সাহায্য করুন।

আগুন থেকে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায়
দমকল বাহিনীকে নির্বিঘ্নে তাঁদের কাজ করতে দিন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ৩০৩৫/৮৮

ইলেকট্রনিক্স—Part VII ক্যুইজ বিপ্লব ব্যানর্জী

1. শতকরা প্রায় 100 ভাগ বিশুদ্ধ Semiconductor কে বলা হয়——

2. শতকরা প্রায় 100 ভাগ বিশুদ্ধ Semiconductor এর সাথে সামান্য কিছু অপদ্রব বা impurities মিশ্রিত করে যে Semiconductor তৈরী হয় তাকে বলা হয়——

3. প্রায় 25°C তাপমাত্রায় Silicon দ্বারা তৈরী একটা p-n junction Diode এর Barrier Potential হওয়া উচিৎ —Volt.

4. Germanium দ্বারা তৈরী প্রায় 25°C তাপমাত্রায় একটা p-n junction Diode এর Barrier Potential হওয়া উচিৎ——Volt,

5. সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন Electronics Circuits এ ব্যাপকভাবে মুড়ি-মুরকির মত ব্যবহৃত Timer I·C NE 555 এর frequency of oscillation 'f' =——

6. 144 Volts বিভব প্রভেদে কোন একটি Silicon Diode এর Reverse Current 12 nano-ampere হলে ঐ Diode এর Reverse Resistance হবে——

7. O·I Ohm Internal Resistance যুক্ত একটি 6 Volts Lead-Acid Wet call Batteryকে এক সেকেণ্ড সময় ধরিয়া Short-Circuit Condition এ রাখা হইলে উক্ত এক সেকেণ্ড সময়ে ঐ Batteryটির Capacitance কত ছিল ?

8. তোমার কাছে একটি Stea-down Transformer আছে যার Secondary winding এ দুটো Leads আছে এবং উক্ত Transformer এর Secondary হইতে তুমি একটি Full Wave Rectified Voltage supply তৈরী করতে চাও। এখন তোমার বাড়ীর Line Frequency 50 Hz হইলে তোমার তৈরী Power Supply Unitটির Ripple Frequency কত হইবে এবং উক্ত Power Supplyটি তৈরী করতে কমপক্ষে কয়টি Diode এর প্রয়োজন হইবে ?

9. "Junction Diode এর Junction Capacitance, Diodeটির Reverse Voltage এর পরিবর্তনের সংগে পরিবর্তনশীল", ইহা a) সত্যি, b) মিথ্যা, c) অবান্তর প্রশ্ন এই তিনটির কোনটি ঠিক ?

10. α d-c এবং βd—c এই উভয়ের মধ্যে Transistor এর একটি সুন্দর সম্বন্ধ সূত্র আছে। এই সূত্রটি কি ? কোন ট্রানজিস্টারের α d-c = 0·98 হইলে উক্ত ট্রানজিস্টারের β d-c কত হইবে ?

11. α d-c-র মান কেন সর্বসময় 1 এর চেয়ে কম ?

12. Small A·C signal Condition এ কোন ট্রানজিস্টারের এমিটার ডায়োডের কার্যকরী junctron রোধ $r_{e.}$ = কত হইবে ?

13. দুইটি ট্রানজিস্টারের β d-c যথাক্রমে 51 ও 15, এখন ট্রানজিস্টার দুইটিকে Darlington পদ্ধতিতে সংযুক্ত করা হইলে উক্ত ট্রানজিস্টার দ্বয়ের সম্মিলিত কার্যকরী (effective) β d-c কত হইবে ?

14. 50 Hz এ কার্যকরী একটি Choke এর Inductance 10 Henry হইলে ঐ Chokeটির Inductive Reactance কত হইবে ?

15. কোন একটি Superhet Transistorised Radio Receiver এর IF frequincy 455 KH_z। এখন 680 KH_z কম্পাঙ্কের কোন Radio station Tune করতে Receiverটির Local Oscillator Frequency কমপক্ষে কত হওয়া প্রয়োজন ?

16. কোন T·V Transmitting Station যে Composite Videowave Transmit করে তার Picture Section——modulated এবং Sound Section——modulated.

17. DE MOSFET কি অর্থ প্রকাশ করে ?

18. কোন ট্রানজিস্টারের f_T বলতে কি বুঝ ?

19. Hot-Carrier Diode বা——Diode হল এক ধরনের a) Unipolar Semiconductor Device b) Bipolar Somiconductor Device. c) Unipolar ও Bipolar এর কোনটিই নয়।

20 এক ধরনের Diode আছে যাতে p ও n স্তরের মাঝে তৃতীয় অন্য একটি খুব পাতলা স্তর থাকে। তৃতীয় ঐ স্তরটিকে কি বলে এবং উহার thickness বা width কত ? ঐ ধরনের Diodeকেই বা কি বলে ?

21. "Logic Circuit" বলতে কি বুঝ ?

22. "IMPATT" বস্তুটা কি ?

23. তোমার কাছে একটা 51 Cm T·V set আছে যার Aspect Ratio হইল $\frac{4}{3}$, তোমার T·V Set এর Piture Tube এর Height কত ?

24. 'X'-band তরঙ্গের শুরু এবং শেষ কোথায় ?

25. ইলেকট্রনিক্সের জগতে T^2L, ECL এবং I^2L কি অর্থ প্রকাশ করে !

(উত্তর 41 পৃষ্ঠায়)

গণ্ডারের গল্প

দাশরথি চক্রবর্তী

বাংলায় একটা কথা আছে—'মারি ত গণ্ডার, আর লুটি ত' ভাণ্ডার।' গণ্ডার মারা খুব সহজ নয়—আবার ভাণ্ডার লুট করাও বেশ হিম্মতের ব্যাপার। কাজেই কোনও একটা বিরাট কাজ করতে গেলে অনেক সময় লোকে এই রকম কথা বলে থাকে।

যাই হোক গণ্ডার তোমরা অনেকেই হয়ত চিড়িয়াখানায় দেখেছ। যদি কেউ আসামের কাজিরাঙ্গায় বেড়াতে যাও তাহলে সেখানেও গণ্ডার দেখতে পাবে। গণ্ডারের ইংরাজী নাম রাইনোসেরস। গ্রীক শব্দ থেকে কথাটা এসেছে যার অর্থ হল—নাকে শিং গজিয়েছে এমন জন্তু। বিজ্ঞানীদের ভাষায় গণ্ডার এসেছে রাইনোসেরোটিডি ফ্যামিলি থেকে। যাদের থাকে একটা মাত্র শিং তাদের বলা হয় রাইনোসেরস ইউনিকর্নিস। এরা হচ্ছে ভারতীয় গণ্ডার। সেই রকম আফ্রিকার দুটো শিংওয়ালা গণ্ডারকে বলা হয় রাইনোসেরস বাইকর্নিস।

আমাদের দেশে গণ্ডারের আসল আড্ডার জায়গা হল আসাম রাজ্য। এছাড়া নেপাল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা দ্বীপেও গণ্ডার দেখা যায়। আফ্রিকায় দু'ধরনের গণ্ডার দেখা যায় —এক ধরনের চেহারা বেশ ভারিক্কি আর রং কালো। একটার ওজন কত হবে ভাবতে পার? তা প্রায় দেড় হাজার কেজির কম নয়। উঁচুও পাঁচ ফুট। এরা একা একা থাকতেই বেশি ভালবাসে। দ্বিতীয় জাতের গণ্ডারের রং হল সাদা। অবশ্য একেবারে সাদা বললে ভুল হবে। আসলে এই জাতের গণ্ডারের রং অনেকটা ধূসর বর্ণের। এরা ওজন এবং আকারে কালো গণ্ডারের চাইতে বড়। উচ্চতায় প্রায় ছ'ফুট। ওজনও প্রায় চার হাজার কেজির কাছাকাছি। এরা দল বেঁধে থাকতে ভালবাসে।

আমাদের ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে। ধরণী পণ্ডিত ক্লাশে এসে সহপাঠী তারককে দুষ্টামি করার জন্য অনেক সময় বেধরক পেটাতেন। কিন্তু আশ্চর্য অত মার খেয়েও শ্রীমান তারকের চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও বেরোত না। পণ্ডিত মশায় বলতেন—'ব্যাটার গণ্ডারের চামড়া।'

কোনও লোককে হাজার অপমান, কটূক্তি বা বিদ্রূপ করলে যদি সে কোনও প্রতিবাদ না-জানিয়ে মুখ বুজে তা হজম করে - তখন সেই লোককে আমরা ঠাট্টা করে বলে থাকি—'লোকটার গণ্ডারের চামড়া।'

এটা ঠিক যে দুনিয়ায় যত জন্তু-জানোয়ার আছে তার মধ্যে গণ্ডারের মতো এত শক্ত চামড়া সম্ভবত আর কারোরই নেই। এই চামড়ার ভাঁজও গণ্ডারের দেহে দেখবার মতো। মনে হয় এটা যেন চামড়া নয় পুরু ধাতুর পাতকে দুমড়ে-মুচড়ে কেউ যেন তার গায়ে পরিয়ে দিয়েছে। এই দুর্ভেদ্য চামড়ার বর্মই গণ্ডারকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। এই দারুণ পুরু চামড়া ভেদ করে বন্দুকের গুলিও ঢুকতে পারে না। সিংহের প্রচণ্ড থাবাও গণ্ডারের চামড়া ছিঁড়ে ভিতরের মাংস টেনে নিতে পারে না।

আগেকার দিনে ঢাল-তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধের সময় ঢাল তৈরি হ'ত গণ্ডারের চামড়া দিয়েই। অবশ্য ভারতীয় গণ্ডারের চেহারাতেই এই রকম পুরু চামড়ার ভাঁজ চোখে পড়ে।

গণ্ডারের মাথার শিংকে আমরা বলি খড়্গ বা খাঁড়া। এই শিং বা খাঁড়া অন্যান্য জন্তুর মতো মাথার দু'পাশে থাকে না। একটা খাঁড়া থাকে ঠিক নাকের উপর—আরেকটা তার পেছনে। আমাদের ভারতে যেসব গণ্ডার দেখা যায় তাদের অবশ্য দুটো খড়্গ থাকে না। নাকের উপর একটা খড়্গ বসানো থাকে। এই খড়্গই হচ্ছে গণ্ডারের লড়াই ও আত্মরক্ষা করবার একমাত্র হাতিয়ার। মাথার চামড়ার উপর থেকেই এই খাঁড়া গজায়। কি ভাবে জান? একরাশ ঘন লোম ঐ নাকের কাছ থেকে বেরিয়ে চাক বাঁধে। তারপর প্রচণ্ড চাপে লোমের চেহারাটা বদলে গিয়ে সেখানে এই তীক্ষ্ণ খড়্গ গড়ে ওঠে। ফণী মনসা গাছের পাতা রূপ পাল্টিয়ে ধারালো কাঁটায় রূপান্তরিত হয়— অনেকটা সেই রকম ব্যাপার আর কি!

গণ্ডার ঘাস, পাতা, ডালপালা এই সব খেয়েই বেঁচে থাকে। কাজেই বলা চলে যে পুরোপুরি নিরামিষাশী প্রাণী।

কিন্তু আহারে নিরামিষাশী হলে কি হবে রেগে গেলে ওরা ভীষণ ভয়ংকর হয়ে ওঠে। গণ্ডারের আক্রমণে অনেক সাহসী শিকারীকেও প্রাণ হারাতে হয়েছে।

লোকে বলে গণ্ডারের গায়ে যেমন জোর আছে, বুদ্ধির প্রখরতা কিন্তু সে তুলনায় তার অনেক কম। দৃষ্টিশক্তিও গণ্ডারের তীক্ষ্ণ নয়। খুব জোরে ছুটবার সময় গণ্ডার তার ভারী দেহটাকে ইচ্ছামতো ঘুরিয়ে নিতেও পারে না। তাই গণ্ডার শিকারের সময় অভিজ্ঞ শিকারী তার সামনের পথ ছেড়ে দিয়ে চট্ করে ঘুরে আঁকা বাঁকা পথ ধরলে গণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে আক্রমণ করতে পারে না। গণ্ডার শিকারের সময় শিকারী তার ঘাড়ের নরম জায়গায় এবং পায়ে গুলি চালায়। এর ফলে গণ্ডারকে সহজেই কাবু করা যায়।

গণ্ডার সব সময় জলে কাদায় পড়ে থাকতে ভালবাসে কেন জান? গণ্ডারের চামড়ার ভাঁজের গর্তে অসংখ্য পোকা বাসা বাঁধে। এর ফলে গণ্ডারের ভারী অস্বস্তি বোধ হয়। সারা দেহ তার পোকার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সে কাদা জলে আশ্রয় নিলে পোকার দল পালিয়ে যায় নতুবা ভাঁজের জল কাদার মধ্যে থেকে বেরুতে না পেরে প্রাণ হারায়। অনেক সময় এক ধরনের পাখিও এসে গণ্ডারের পিঠে বসে পোকাগুলো খায়। বিপদের সংকেত পেলে এই পাখির দলই আবার এক ধরনের চিৎকার করে গণ্ডারকে সতর্ক করে দেয়।

ইলেক্ট্রনিক্স ক্যুইজ Part VII এর উত্তর

1. Intrinsic Scemiconductor, 2. Extrinsic Semiconductor, 3·0·7, 4. 0·3, 5. $\frac{1.44}{(R_1+2R_2)C_1}$, (Astable condition-এ) 6. 12,000 Meghoms, 7. 10 Farads, 8. $100H_z$, 9. (a), 10. [$\beta = \frac{1}{1-\alpha}$, 49]

11. আমরা জানি $\alpha d-C=\frac{IC}{IE}=\frac{IC}{IC+IB}$ যেখানে IE = IC + IB কাজেই IC-র মান সব সময় IC ও IB মানদ্বয়ের যোগফলের সমষ্টি অপেক্ষা ছোট। এখন কোন ভগ্নাংশ সংখ্যার লব উহার হর অপেক্ষা ছোট হইলে মূল ভগ্নাংশ সংখ্যাটির মান সব সময় 1 এর চেয়ে কম হইবে।

12. $\frac{25mv}{IE}$, 13. 765, 14. (প্রায় 3140 ohm), 15. 1135 KHZ, 16. (Amplitude, Frequency), 17. Depletion Enhancement Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, 18. f_T বা Gain Bandwidth Product হল কোন ট্রানজিস্টারের এমন এক frequency যে frequencyতে কোন ট্রানজিস্টার কাজ করার সময় ট্রানজিস্টারের β-এর মান 1 এ গিয়ে দাঁড়ায়, 19. [Schotky; (a)], 20. তৃতীয় ঐ স্তরটি হ'ল প্রায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অর্থাৎ Intrinsic বা Undoped অর্দ্ধ পরিবাহীর স্তর যার thickness বা width হ'ল 10 to 100 micrometer, আর Diode টিকে বলে p-i-n diode, 21. Logic circuit হ'ল সেই ধরনের circuit যাকে Boolean Algebra দ্বারা সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। 22. IMPATT হ'ল এক ধরনের Diode যার পূর্ণ অর্থ হ'ল Impact Avalanchee Transit Time Diode, যাকে Reverse Bias mode এ কোন Microwave Cavity-র মধ্যে প্রতিস্থাপন করলে Diodeটি নিজেই সেণ্টিমিটার বা তারও নীচের কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কম্পাঙ্কে Oscillate করতে শুরু করে, 23. অঙ্কের হিসাবে 30·6 সেণ্টিমিটার [Aspect Ratio = $\frac{4}{3}$ এবং $(Width)^2+(Height)^2=(Diagonal\ length)^2$ এই সূত্রদ্বয় ব্যবহার করিয়া], 24. 8GHZ হইতে শুরু করিয়া 12GHZ পর্যন্ত, 25. Transistor Transistor Logic, Emitter Coupled Logic, Integrated Injeetion Logic,

---

17, যাদব ঘোষ রোড, সরশুনা, কলকাতা-61

জানা-অজানা

সাধারণ উদ্ভিদের অসাধারণ গুণ

নয়নতারা

আমরা সকলেই নয়নতারা গাছকে চিনি। বাড়ির বাগানে, টবে, এমনকি বাড়ির আনাচে-কানাচেও এই গাছটিকে আমরা দেখে থাকি। কিন্তু এর অসাধারণ গুণের খবর আমরা ক'জন রাখি? নয়নতারার বৈজ্ঞানিক নাম Catharanthus Alba। এরই অপর প্রজাতির গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম Catharanthus Roseus। ইংরেজি নাম Vinca roses। গাছটি অ্যাপোসাইনেসী গোত্রীয়।

নয়ন তারা

নয়নতারা গাছটিকে কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ কাজে লাগাই না। কেবলমাত্র পাতা ও শিকড়কেই আমরা বিশেষ ভাবে কাজে লাগাই। এই পাতা ও শিকড় থেকে বর্তমানে বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করা হচ্ছে। যার মধ্যে ভিনক্রিস্টিন ও ভিনব্লাসিন উল্লেখযোগ্য। আর এই উৎপাদিত দ্রব্যগুলি কি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে জানো? এই দ্রব্যগুলি থেকে ক্যানসার রোগের ওষুধ তৈরি হচ্ছে।

একটু অবাক হয়ে পড়েছো, তাই না? না, অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই রকমই বহু গাছ আছে যারা আমাদের বিভিন্ন রোগের ওষুধ প্রস্তুতিতে সাহায্য করে চলেছে। এবারে নিশ্চয়ই গাছটির প্রশংসা না করে পারবে না।

তুলসী

গাছটির নাম শুনে নিশ্চয় কিছুটা ধারণা হচ্ছে? হাঁ, আমাদের বাড়ির তুলসী গাছের মতনই কতকটা চেহারা এবং পাতার গন্ধও অনেকটা একই রকমের। তবে একেবারে এক নয়। এই গাছটিকে দার্জিলিং-এ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে বাড়ির আশে-পাশের জঙ্গলে যে একেবারে পাওয়া যায় না, তা নয়।

এই গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম Ocimum Killimandse Haricum। গাছটি ইউফরবিয়েসী গোত্র ভুক্ত। গাছটির পাতাই আমাদের একমাত্র সাহায্য করে। বর্তমানে বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে এই গাছটি থেকে কর্পূর তৈরি হচ্ছে। কর্পূর তৈরিই কিন্তু সব শেষ নয়। এই উৎপাদিত কর্পূর থেকে আবার বিভিন্ন ওষুধও তৈরি হয়। যেমন, কিছু সর্দি কাশির সিরাপ তৈরিতে এই কর্পূর এখন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার ধরো, হঠাৎ তুমি পড়ে গিয়েছো, ফলে মুচকিয়েও গিয়েছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা করছে। সেই সময়ও কিন্তু তোমার বেদনা প্রশমন করবে এই কর্পূর।

অনুপম বড়াল

সব ফুলের রং এক হয় না কেন?

রং বলতে আমরা এখানে বর্ণকে (colour) বলে থাকি। রোজদিন আমরা আমাদের সামনে যে সব ফুলের গাছ দেখতে পাই, সেই সব বিভিন্ন ধরনের গাছে বিভিন্ন রং এর ফুলের সমারোহ দেখতে পাই। ফুল এমন একটা জিনিস যেটা আমাদের রোজকার জীবনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সব ভিন্ন ভিন্ন ফুলের রং এক হয় না কারণ, যে সব বস্তু সূর্য রশ্মিকে প্রতিফলিত করে সেই সব বস্তুর অণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিন্যাসেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বা রং এর সৃষ্টি করে। এই সব বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে সাজানো আছে। আর সেই কারণেই একই সূর্যরশ্মি প্রাপ্ত বিভিন্ন পদার্থের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়, সেই জন্যই তাদের বর্ণও বিভিন্ন রকমের হয়।

সৌরভ দে

যুগের ভিতর যুগ

চিত্রনাট্য – অনিল কর্মকার
ছবি – গৌতম কর্মকার

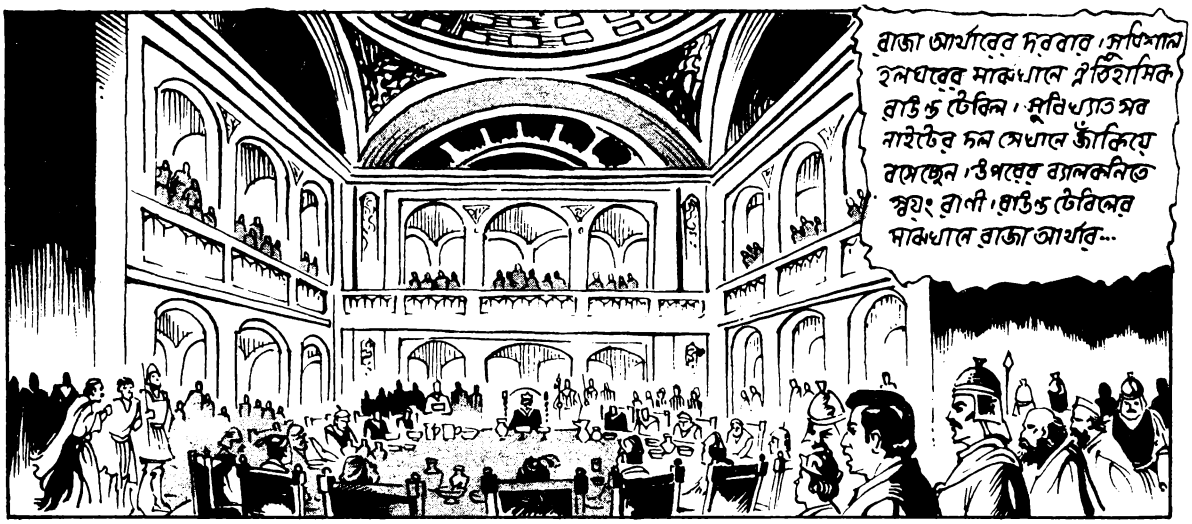

জয় মহান নাইট ল্যান্সলটের জয়!
ওহ, সাতটা দৈত্য··নজন যোদ্ধা·· একশো বিয়াল্লিশ জন নারী··· স্যার কে আর এক ডাক্তু বেশী টানলে বোধহয় সংখ্যাগুলো এর দ্বিগুণ হয়ে যেতো।
বলো কি ক্লারেন্স?
সর্বনাশ, এ যে যাদুকর মার্লিন এসে হাজির! মিথ্যুকের চূড়ামনি। লোকে ওর যাদুর ভয় যতো না করে, ততো ভয়করে ওর হাজার বার বলা গল্প। এক ভাষা, এক ভঙ্গী।
গল্প শুরু করে দিল মার্লিন···
চলতে চলতে রাজা আর্থার এসে পড়লেন একটা হ্রদের সামনে। জলের মাঝখানে একটি হাত·· সেই হাতে এক খানি তলোয়ার ·· জলের উপর বিরাজ করছেন এক অপরূপ রূপসী··
কী কান্ড! রাজা পর্যন্ত গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন-
সারা সভাও ঘুমে কাতর···
সুযোগ পেয়ে ইঁদুরগুলো পর্যন্ত গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এলো। একটা তো সোজা খাবার নিয়ে উঠে পড়লো রাজার মুকুটে।
10

গল্প শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সভাও জেগে উঠলো আপনা-আপনি...
আসুন, এবার সভার কাজ শুরু করা যাক।
উঠে গেলেন স্যার কে...
এই আমার বন্দী। রাক্ষসটাকে যখন আক্রমণ করলাম, ও কী করলো জানেন? এক লাফে দু'শো হাত উপরে একটা গাছের মগডালে উঠে বসলো।
অমনি আমিও একখানা পাথর তুলে - একটা গরুর মতো আকারের বিরাট পাথর, দিলাম ছুঁড়ে সেই দু'শো হাত উপরে... অমনি ধপাস করে ব্যস-- আমিও তলোয়ার ধরে...
ওহ, কী মিথ্যুক!
বেশ, ওকে নিয়ে কী করতে চাও এখন?
আমার ইচ্ছে - আগুনে পুড়িয়ে মারা। অনেক দিন কাউকে পুড়ে মরতে আমরা দেখিনি।
বেশ, তাই হোক।
ওর ওই উদ্ভট পোষাকগুলো খুলে নাও। ওগুলো মন্ত্রপূত। ওগুলো ওর গায়ে থাকলে আগুন ছোঁবে না। যাও, খুলে নাও প্রহরী।
তখনি আমাকে বন্দীশালায় পাঠানো হোল।... পরের দিন সকাল...
ক্লারেন্স, আমাকে কি সত্যিসত্যিই পুড়ে মরতে হবে?
উপায় কি! পালাবার পথ যে বন্ধ।
সেকি!
ঐ বুড়ো যাদুকর এই অন্ধকূপের চারপাশে গণ্ডী কেটে দিয়েছে।
বেরুবার চেষ্টা করলেই মরবেন।
ওহ, তাই নাকি! হো হো হো...
11

হাসবেন না, হাসবেন না। মার্লিনকে নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই। ও ঠিক জানতে পারবে এবং প্রতিশোধ নেবে।

ওই মার্লিন? ও আমার কী করবে? জানো না, আমি ওর চেয়ে অনেক বড় যাদুকর?

আপনি! যা-দু-ক-র! সত্যি বলছেন?

নিশ্চয়। সাতশো বছর ধরে মার্লিন আমার সমকক্ষ হবার বৃথা চেষ্টা করছে।

যাও মার্লিন, রাজাকে বলো- আমাকে যদি পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করা হয়, তবে কাল ঠিক বেলা বারোটায় আমি আকাশ থেকে সূর্যকে মুছে দেবো।

সারা পৃথিবী ঘুটঘুটি অন্ধকারে ঢেকে যাবে। আলোর অভাবে জীবজগৎ তরুলতা সব কুঁকড়ে কুঁকড়ে মরে যাবে।

আমি যাচ্ছি স্যার। এমন ভয়ঙ্কর কাজ দয়া করে করবেন না।

আরো খানিক পর...

চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

বধ্যভূমিতে।

সেকি! বধ করার নির্দিষ্ট সময় তো আগামী কাল বেলা বারোটায়?

না, রাজা আর অপেক্ষা করতে চান না।

কেন, কেন?

মহাযাদুকর মার্লিনের পরামর্শে।

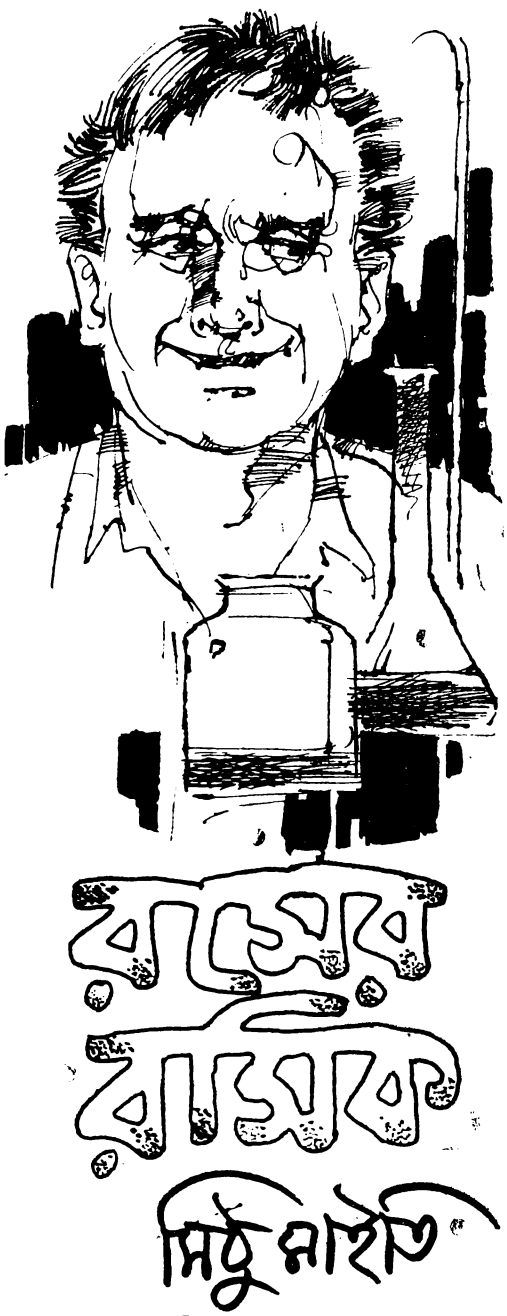

প্রফেসর ঘোষের এ এক হয়েছে জ্বালা। না পারেন নিজের মনের কথা পরের কাছে বলতে, না পারেন সবার সঙ্গে ভালো করে মিশতে। আসলে ক্ষ্যাপাটে মানুষ হলে যা হয়। সারাদিন বইয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন, তার উপর রসায়ন তার প্রিয় বিষয়। একেবারে সোনায় সোহাগা, কথায় কথায় রসায়নের রসনা জিভে লেগেই আছে। অকৃতদার, আসলে বিয়ে করার সময়ই পাননি, কিভাবে বছরগুলো তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে নিজেই বুঝতে পারেন নি; বাড়ীতে লোক বলতে ভৃত্য সাধুচরণ ছাড়া আর কেউ নেই। বড়দা অন্যত্র থাকেন; সারাদিন নিজের গবেষনায় মেতে আছেন। বাইরে বেরোন না। বেরোলে বিপ্রাষ্ঠগুলো একে একে জড়ো হয়; তাই পাড়ার ছেলেরা সখ করে নাম রেখেছে ঃ 'রসের রসিক'।

একদিন পথে বেরিয়েছেন, রাম বাবুর সঙ্গে দেখা। নমস্কার প্রতি নমস্কারের পালা শেষ হলো। এমনি কথা প্রসঙ্গে ঘোষ বাবু রাম বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা ক'ভাই? রামবাবু উত্তর দিলেন, তিন ভাই। ঘোষ বাবু হুর্‌রে স্বরে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, আরে হবেই তো। জৈব যৌগ পরিবার যে, হাইড্রোজেনের পাশে কার্বন আর অক্সিজেন না থাকলে কি চলে। বেচারা রামবাবু কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, ঘোষবাবু রসিকতা করছে। হঠাৎ তিনি গম্ভীর হয়ে মুখ ফুলিয়ে হন্‌হন্ করে হাঁটা দিলেন, আর ঘোষ বাবু এসব দেখেই থঃ। তিনি আর কি করেন, বাড়ীর দিকে হাঁটা দিলেন।

এহেন প্রফেসর ঘোষ একদিন বিপদে পড়লেন। সাধুচরণ কিছুদিনের জন্য দেশে গেলেন, তখন তিনি একা। অগত্যা নিজেকে রান্না-বান্না করে নিতে হবে। দেখলেন তরি-তরকারি সব ঠিক আছে। কিন্তু সল্ট্ নেই,—দোকানে যেতেই হবে।

দোকানে গিয়ে দোকানীকে বললেন—এক কিলো সোডিয়াম ক্লোরাইড দেখি। বলা ভালো যে রসায়নের কারবার করে তিনি প্রচলিত জিনিসপত্রের নাম ভুলে গেছেন। দোকানদার ভাবলেন সোডামাটি চাইছে। তাই তিনি সোডামাটি ভরছেন। প্রফেসরের চোখ ওদিকে পড়তেই বলে উঠলেন ও কি। ওগুলো কি দিচ্ছেন, আপনার কাছে সোডিয়াম ক্লোরাইড চাইছি।

হাজির। তিনি আবার একটু নিরিবিলিতে থাকতে ভালোবাসেন। তারা এসেই ঘোষবাবুর দু'হাত ধরে বললো, কাকু একটা গল্প শোনাও, ঘোষবাবুর রাগ হলো। আবার পরক্ষণেই বুঝলেন, এরা কচি বাচ্চা, ওদের ওপর রাগ করা সাজে না।

অরা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল

বেচারা তো হতভম্ব! সে বললো, বাবু আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। ওসব ইঞ্জিরি কি আমি বুঝি, ঘোষ বাবু। ঘোষ বাবু ধাঁধায় পড়লেন, কি করা যায়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এলো বললেন—বললেন ওই যে ভাত দিয়ে মেখে খায়?

এমন সময় দোকানী বলে ওঠলেন, ও বুঝেছি, নুন? 'ইয়েস, ইয়েস, ইউ আর গ্রেট। আমি ওটাই চাইছি। কি কি বললেন যেন, নুন, না!' তারপর তিনি নুন নিয়ে বাড়ীর দিকে হাঁটা দিলেন!

বাড়ীতে এসে দেখলেন দাদা, বৌদি ও তার দুই ছেলে মেয়ে এসেছে, দাদা জিজ্ঞেস করলেন, কি রে কোথায় গেছিলিস? হাতে ওটা কি?—'আর বোলো না, নুন।' ঘোষবাবু বললেন।

জীবন বাবু তাঁর ছেলে মেয়েকে বললেন, এই দেখ্, এটা হচ্ছে তোর রময়েন কাকু। খুব পণ্ডিত বুঝলি? পিকু আর মামনি মাথা নেড়ে সায় দিল। বৌদিকে বললেন, তাহলে রান্নার ভারটা তুমিই নাও।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দু' ভাইবোন প্রফেসরের কাছে গল্প শোনার বায়না ধরল।

অগত্যা তিনি আরম্ভ করলেন,—শোনো একটা গল্প। কিন্তু মনে মনে ভাবলেন কি গল্প বলি? রাজা রানীর গল্প তো আমি জানি না। রসায়নের গল্প বললে কেমন হয়? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। 'শোনো, আমি একটা গল্প বলবো। কিন্তু কখনো প্রশ্ন করবে না। বুঝলে? তারা মাথা নেড়ে সায় দিল।

'দু' ভাই, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন।'

'এ রকম বিদ্‌ঘুটে নাম?'—মামনির প্রশ্ন।

'একদিন দুপুরে পোস্ট অফিস থেকে বাড়ী ফিরছে, মাথার উপর উত্তপ্ত সূর্য। পথে তাড়া করলো ক্ষ্যাপা ষাঁড়। যেমনি দু'ভাই পরস্পরের হাত ধরে ছুটলো, তারা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল।'

'এ কি রকম গল্প। মাথা নেই মুণ্ডু নেই', পিকু বলে ওঠে।

'বাবা মা কেঁদেই অস্থির, রেডিও-টিভি-কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে তাদের ছবি টাঁঙিয়ে দেওয়া হলো। খুঁজবার জন্য ডিটেক্‌টিভ্ লাগানো হলো, কিন্তু বৃথাই খোঁজা। কোন সন্ধান নেই।'

'এর কারণ তা কি জানিস, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন পরস্পর বিক্রিয়া করে জল তৈরী করে। আর সেই জল সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে আকাশে মেঘের আকারে জমে থাকে। আর বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে।'

পিকুর প্রশ্ন, 'ধ্যাস্, এটা গল্প নাকি?'

---

20 এ, জয়কৃষ্ণ পাল রোড, কলকাতা-700038

খেলাধূলার টুকিটাকি

অজয় দাশগুপ্ত

অলিম্পিক গেমস্

পাঁচটি রিং—একটির মধ্যে একটি ঢোকানো, এই প্রতীকটি হল অলিম্পিক্স গেমসের। এখানে পাঁচটি রিংয়ের অর্থ পাঁচটি মহাদেশ।

এশিয়ায় প্রথম অলিম্পিক্স-এর আসর বসে 1964-তে, জাপানের টোকিও শহরে। তারপর এই দীর্ঘ চব্বিশ বছর বাদে 1988-র অলিম্পিক্স গেমস বসতে চলেছে এশিয়ার অন্তর্গত দেশ দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সোল শহরে।

এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের 17 তারিখে 1988 সালের 16 দিনের অলিম্পিক্স উৎসব শুরু হবে। এইটি হবে ক্রমিক অনুসারে 24তম অলিম্পিক্স গেমস। উদ্বোধন সঙ্গীত রচনা করেছেন আমেরিকার টম হুইটলক, গানটির সুর দিয়েছেন ইতালির গিয়রগিয়ো মবেড়ার। গানটির প্রথম লাইন 'হ্যাণ্ড ইন হ্যাণ্ড'।

সিওল অলিম্পিকের মাসকট

শুরুর মুহূর্তে দক্ষিণ কোরিয়ার SLOOC-র প্রধান যথার্থ বলতে পারবেন; স্বপ্ন সম্ভব হল এতদিনে। সত্যিই এ এক স্বপ্ন।

সোলের দক্ষিণ-পূর্বে হান নদীর তীরে তৈরি হয়েছে অলিম্পিক্স স্টেডিয়াম। সর্বকালের রেকর্ড সৃষ্টিকারী 161টি দেশ ইতিমধ্যেই অংশগ্রহণের সম্মতি জানিয়েছে। 167টি দেশের অলিম্পিক কমিটির মাত্র 6টি দেশ অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকছে।

যদিও সরকারি ভাবে যোগদানের শেষ তারিখ চলে গেছে, তবুও রাষ্ট্রপতি পার্ক উৎসব শুরুর এক মাস আগেও বাকি দেশগুলির যোগদানের বন্দোবস্ত করবেন।

তিন মাস আগে থেকেই সোলের পথে পথে ফেস্টুন লাগানো হয়ে গেছে। সোলের সিটি হলের সামনে অলিম্পিকের প্রতীক ও স্মারক টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এই অলিম্পিকে 404 মিলিয়ন ডলার আয় হবে।

সোল অলিম্পিকে কি রেকর্ড হবে তা এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে, কিন্তু পূর্ব ইউরোপের ও সোভিয়েত দলের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জন্য পইচিং তৈরি হয়ে আছে। প্রতিটি প্রতিযোগীই লাতিন ভাষায় সেই তিনটি শব্দ 'সিটিয়াস' 'অলটিয়াস' 'ফরটিয়াস' অর্থাৎ দ্রুততর উচ্চতর, শক্তিতরকে লাভ করবার চেষ্টা করবে।

সারা বিশ্ব আজ সোলের দিকে তাকিয়ে। আশা করব ভারত সেখানে আবার স্থান করে নিক স্বকীয় মহিমায়।

উইম্বলডন টেনিস

লণ্ডনের একটি অঞ্চলের নাম উইম্বলডন। যেমন কলকাতার ভবানীপুর বা জোড়াসাঁকো। কলকাতার যেমন উডল্যাণ্ডস বিখ্যাত টেনিস খেলার জন্য। তেমনি সমস্ত পৃথিবীতে উইম্বলডন বিখ্যাত টেনিস খেলার জন্য। পৃথিবীর সবচেয়ে ঐতিহ্যময় টেনিস প্রতিযোগিতা বলতে বোঝায় উইম্বলডন প্রতিযোগিতাকে।

পাওয়ার টেনিস এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি অর্থকরী প্রতিযোগিতা। টেনিস খেলায় বিশ্ব পর্যায়ের ক্রম অনুসারে যার নাম তালিকায় পঞ্চাশ জনের পরে। তিনিও যে কোনো শ্রেষ্ঠ ফুটবল বা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি পয়সা পান। অর্থাৎ বিজয় অমৃতরাজ, কপিলদেব বা গাভাসকারের চেয়ে বিত্তশালী।

পাওয়ার টেনিস তিন রকম কোর্টে খেলা হয়। গ্রাস কোর্ট, ক্লে-কোর্ট ও হার্ড কোর্ট। যিনি গ্রাস কোর্টে ভাল

খেলেন তিনি বাকি দুটো কোর্টে ভাল খেলতে পারেন না। আবার অন্য দুকোর্টের ভাল খেলোয়াড়রা গ্রাস কোর্টে ভাল খেলতে পারেন না। যেমন ইভান লেণ্ডল 1988-র উইম্বলডন শুরুর আগে পর্যন্তও এক নম্বর খেলোয়াড় ছিলেন, কিন্তু তিনি গ্রাস কোর্টে সুবিধে করতে পারেন না। এ পর্যন্ত একবারও তিনি উইম্বলডন জিততে পারেন নি। পাওয়ার টেনিস খেলায় দেখা যায় 18 বছর বয়স থেকে 28 বছর এই দশটি বছরই একজন খেলোয়াড় ভাল খেলে থাকেন। যদিও ব্যতিক্রম আছে। যেমন জারস্লভ ড্রবনি, ক্রিস এভার্ট, কেন রোজওয়েল প্রভৃতি।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চারটি টেনিস প্রতিযোগিতাগুলি হল ইউ এস ওপেন, ফ্রেঞ্চ ওপেন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। এই চারটি প্রতিযোগিতাকে বলা হয় গ্রাণ্ড স্লাম। যদি কোনো প্রতিযোগী একই বছরে এই চারটি প্রতিযোগিতা জেতে তাঁকে গ্রাণ্ড স্লাম জয়ী বলা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ইংরেজ ও ফরাসীরা টেনিসে আধিপত্য বজায় রেখেছিল। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা টেনিসে প্রভূত উন্নতি করে।

এখন আর কোনো দেশ পেছিয়ে নেই। সমাজতন্ত্রী দেশের বহু প্রতিযোগী বিশেষ ফল দেখিয়ে সবাইকে অবাক করে দেয়। এর মধ্যে চেকোস্লোভোকিয়া যুগোশ্লাভিয়া। রাশিয়া সুইডেন প্রভৃতি দেশের নাম করা যায়। সুইডেনের বিয়ন বর্গ তো সোনার অক্ষরে তাঁর নাম লিখে রেখেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের চেয়ে আজকের টেনিসে অনেক বিবর্তন এসেছে। এখন পুরো খেলাটাই বডি ফিটনেসের ওপর নির্ভর করে। আগে ছিল ব্যক্তিগত কৌশলের ওপর।

উইম্বলডনে আগে কোনো প্রোফেশনাল খেলোয়াড় যোগদান করতে পারত না। এখন এই নিয়ম পাল্টে গেছে।

এই নিয়ম চালু থাকার জন্য পাঞ্চো গঞ্জালেসের মতো বিরাট মাপের খেলোয়াড় উইম্বলডন জিততে পারেন নি।

ভারতে টেনিস চর্চা হয় ঠিকই। কিন্তু বড় মাপের প্রতিভা উঠে আসে না। এর কারণ জাতীয় স্তরে অনীহা। তারই মধ্যে গউস মহম্মদ উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে সকলকে অবাক করে দেন। এরপর রমানাথন কৃষ্ণন দুবার সেমিফাইনালে পৌঁছতে পেরেছেন। এই দুবারই রমানাথন কৃষ্ণন উইম্বলডন ক্লক-তালিকায় 3 ও 8 নম্বর পেয়েছিলেন। কৃষ্ণনের পর অমৃতরাজ ভাইরা আন্তর্জাতিক টেনিসে প্রভূত নাম করেন। গত বছর রমেশ কৃষ্ণন ইউ এস ওপেন কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে হেরে যান। বিজয় অমৃতরাজ বহু আন্তর্জাতিক টুর্ণামেণ্ট জয় করেছেন। তিনি টেনিস জগতে খুবই পরিচিত এবং জনপ্রিয়।

এ পর্যন্ত উইম্বলডনে মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা পরপর ছয়বার ট্রফি জিতে এক অনন্য রেকর্ড করেছেন। এ বছর জিততে পারলে তিনি হেনরি মুভির 9 বার জয়ের রেকর্ড ছুঁতে পারতেন। কিন্তু তা হল না। ঊনিশ বছরের কিশোরী স্টেফি গ্রাফের কাছে হেরে যান। নাভ্রাতিলোভার বয়স 31 বছর।

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে॥ প্রতি খণ্ড দাম ১০৲

অর্দ্ধশত মডেলের নির্মাণ প্রণালী ও সার্কিট ডায়াগ্রাম সহ

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ॥ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

স্থিতিস্থাপকতা কি ও কেন

সমীর কুমার ঘোষ

একটা সরু লম্বা রাবারের টুকরাকে (গার্ডারজাতীয়) টানলে সেটা যে দৈর্ঘ্যে বেড়ে যায়, একথা আমরা জানি। আবার টান ছেড়ে দিলে, টুকরাটি আগের আকারে ফিরে আসে। কিন্তু ঐ একই মাপের একটা লম্বা লোহার তারকে, ঐ পরিমাণ বাড়াতে গেলে প্রচুর বলপ্রয়োগ করতে হয়। এর কারণ কি? আসলে, বাইরে থেকে কোন বস্তুর উপর বলপ্রয়োগ করলে, ঐ বলের প্রভাবে, বস্তুর আকার এবং আয়তনের পরিবর্তন ঘটে। এই অবস্থায় বস্তুটির ভিতর থেকে একটি অভ্যন্তরীণ বলের সৃষ্টি হয়, যা ঐ পরিবর্তনকে বাধা দিতে চেষ্টা করে। যে ধর্মের সাহায্যে কোন বস্তু এরকম বাধা দিতে পারে বস্তুর সেই ধর্মকে বলে 'স্থিতি-স্থাপকতা' (elasticity)। যে বস্তুর বাধা দেওয়ার ক্ষমতা যত বেশী তার স্থিতিস্থাপকতাও তত বেশী। সেই হিসাবে লোহার স্থিতিস্থাপকতা রবারের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু আমরা সাধারণ ভাবে বলি যে, 'রাবার লোহার চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপক' কিন্তু পদার্থবিদ্যার ভাষায় ব্যাপারটা ঠিক উল্টো, বাহ্যিক বলের প্রয়োগের, যে বস্তুর আকার ও আয়তনগত পরিবর্তন যত কম হয়, সে তত বেশী স্থিতি-স্থাপক—সেই হিসাবে 'লোহা রাবারের চেয়ে অনেক বেশী স্থিতিস্থাপক' (Iron is more elastic than rubber),

আকার বা আয়তনগত সম্ভাব্য পরিবর্তনের বিচারে বস্তুকে মোটামুটিভাবে তিনশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রযুক্ত বলের প্রভাবে বস্তুর যখন বিকৃতি ঘটে, তখন প্রযুক্ত বল অপসারণের পরে, যদি ঐ বস্তুটি আবার নিজের আগেকার আকার বা আয়তন ফিরে পায়, তাহলে ঐ ধরনের বস্তুকে বলে 'পূর্ণ স্থিতিস্থাপক' (Perfectly elastic) বস্তু। আবার বাইরে থেকে প্রযুক্ত বলের প্রভাবে কোন বস্তুর যদি আকারের কিছুই পরিবর্তন না ঘটে তাহলে সেই বস্তুটিকে 'পূর্ণ দৃঢ় বস্তু' (Perfectly rigid) বলা হয়। তার উপর বাহ্যিক বল প্রয়োগ করে তাকে বিকৃত করলে যদি বল অপসারণের পরও বস্তুটি ঐ বিকৃত অবস্থা পুরাপুরি বজায় রাখে, তাহলে বস্তুটিকে 'পূর্ণ প্লাস্টিক' (Perfectly Plastic) বস্তু বলা হয়।

স্থিতিস্থাপক ধর্ম সব বস্তুর ক্ষেত্রে, তার একটা নির্দিষ্ট পীড়ন (Stress) পর্যন্ত বজায় থাকে। এই নির্দিষ্ট পীড়নকে 'স্থিতিস্থাপক সীমা' (elastic limit) বলে। আগেই বলা হয়েছে যে, বাইরে থেকে প্রযুক্ত বলের প্রভাবে সব বস্তুর মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ বলের সৃষ্টি হয়, যা ঐ বস্তুর আকার বা আয়তন পরিবর্তনে বাধা দেয়। এই অভ্যন্তরীণ বলকে বলা হয় 'পীড়ন' এবং যেহেতু উৎপন্ন এই অভ্যন্তরীণ বলের মাত্রা বাইরে থেকে প্রযুক্ত বলের মানের সমান, সেজন্য পীড়ন পরিমাপ করা হয়। বাইরে প্রযুক্ত বলের সাহায্যে এবং প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত বলের পরিমাণ-কেই 'পীড়ন' (Stress) বলা হয়। মনে রাখা দরকার যে, আসলে পীড়ন হল, বস্তুর মধ্যে উৎপন্ন অভ্যন্তরীণ বল কিন্তু এর পরিমাপ করা হয়, বাইরে প্রযুক্ত বলের সাহায্যে। স্বভাবতঃই, প্রযুক্ত বলের প্রভাবে বস্তুর আকার বা আয়তনের পরিরর্তন ঘটে এবং পরিবর্তনকে বস্তুর 'বিকার' (deformation) বলে। আনুপাতিক বিকার বা বিকারের হারকে (relative deformation বলে 'বিকৃতি' (Strain)। অকসফোর্ডের প্রখ্যাত ব্যবহারিক পদার্থবিদ্ রবার্ট হুক (1635 –1703) স্থিতিস্থাপকতার উপর নানা পরীক্ষা শেষে, 1678 খ্রীস্টাব্দে এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বিবৃত করেন। তাঁর দেওয়া সূত্র, বলতে গেলে, বস্তুর স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম আলোচনার বা পরীক্ষার চাবিকাঠি বলে মনে করা যেতে পারে!

হুকের স্থিতিস্থাপকতার সূত্রানুযায়ী, যে কোন বস্তুর ক্ষেত্রে, তার স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে, বস্তুর উপর প্রযুক্ত পীড়ন এবং বিকৃতির অনুপাত একটি ধ্রুবক। এই ধ্রুবকের নাম 'স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক' (modulus of elasticity)। যদি বাহ্যিক বলের প্রভাবে বস্তুর অনুদৈর্ঘ্য (longitudinal) বিকৃতি ঘটে, তখন ঐ গুণাঙ্কের নাম 'ইয়ং গুণাঙ্ক' (woung's modulus)। আবার কোন বস্তুকে মোচড় দিলে তার 'কৃন্তন-বিকৃতি' (Shearing strain) ঘটে। তখন ঐ গুণাঙ্ককে বলে 'কাঠিন্য-গুণাঙ্ক' (Rigidity modulus)। আর যদি প্রযুক্ত বলের প্রভাবে বস্তুর আয়তন-বিকৃতি ঘটে (Volume Strain), তখন ঐ গুণাঙ্ককে বলে 'আয়তন-বিকার গুণাঙ্ক' (Bulk modulus)। সুতরাং পীড়ন ও বিকৃতির অনুপাতকে সাধারণভাবে স্থিতি-

স্থাপক গুণাঙ্ক বলে কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে, এই গুণাঙ্কের ভিন্ন ভিন্ন নাম। সামগ্রিকভাবে, এই সব গুণাঙ্কগুলিকে বলা হয় 'স্থিতিস্থাপক ধ্রুবক' (elastic constants)।

এই তিনটি ধ্রুবক ছাড়াও আর একটি স্থিতিস্থাপক ধ্রুবক আছে। যখন একটি বাহ্যিক বলের প্রভাবে কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়, তখন বস্তুটির প্রস্থ নিশ্চয়ই কিছু হ্রাস পায়। একটি রাবার গার্ডারকে টান দিয়ে বড় করলেই সহজে এই ঘটনাটি চোখে পড়বে। প্রস্থের দিকে যে বিকৃতি ঘটে, তাকে পার্শ্বীয় বিকৃতি' (lateral strain) বলে। ফলে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কোন বস্তুর ক্ষেত্রে, তার স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে, পার্শ্বীয় বিকৃতি ও অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি পরস্পর সমানুপাতিক। এই দুই বিকৃতির অনুপাত, একটি বস্তুর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এবং এই অনুপাতকে বলা হয় 'পয়সন্ অনুপাত' (Poisson's ratio)। প্রখ্যাত ফরাসী পদার্থবিদ্ পয়সন্-এর নামানুসারেই এই অনুপাতটির নাম দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, স্থিতিস্থাপক বস্তুর ক্ষেত্রে মোট 4টি স্থিতিস্থাপক ধ্রুবক আছে। সেগুলি হ'ল, ইয়ং গুণাঙ্ক (a), কাঠিন্য গুণাঙ্ক (n), আয়তন-বিকৃতি গুণাঙ্ক (K) এবং পয়সন্ অনুপাত (δ)। সকল বস্তুর ক্ষেত্রে, এই চারটি স্থিতিস্থাপক ধ্রুবকগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সেই সম্পর্কগুলি হ'ল : (i) $a=3k\ (1-2\delta)$; (ii) $a=2n\ (1+\delta)$; (iii) $9dk=a(n+3k)$ এবং (iv) $3k-2n)=\delta\ (2n+6k)$। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, তাত্ত্বিক-বিচারে যে কোন পদার্থের পয়সন্ অনুপাতের মান হবে—1 থেকে +0 5 এর মধ্যে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর মান সব সময়েই ধনাত্মক হয় কারণ ঋণাত্মক হওয়ার অর্থ হ'ল যে, কোন বস্তুর অনু দৈর্ঘ্য প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বীয় প্রসারণও হবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে, এরকম কোন বস্তু পাওয়া যায় না। সেজন্য বাস্তবক্ষেত্রে বলা হয় যে $0<\delta<0\cdot5$।

বস্তুর স্থিতিস্থাপকতা ও তার ধর্মের ব্যাপক ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে, বস্তুর এই ধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করে। স্থপতিবিদ্যা এবং সেতু ও বিশাল আকারের যান্ত্রিক কাঠামো তৈরীর কাজে, স্থিতিস্থাপকতা ও তার ধর্ম সম্বন্ধে কারিগরী জ্ঞান থাকা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। যে কোন একটা লৌহদণ্ড (beam), যার একপ্রান্ত অনুভূমিকভাবে স্থির থাকে এবং অন্যপ্রান্তে ভার চাপানো হয়, তখন ঐ দণ্ডটি সামগ্রিকভাবে নমনীয় হবে (bending)। এইভাবে নমনীয় দণ্ডকে cantilever বলে। সেতুনির্মাণের কাজে, এই cantilever-এর ব্যাপক ব্যবহার হয় এবং এর নমনের পরিমাণ, সহনশীলতা ও তার ধর্ম সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। স্থিতিস্থাপকতা ও তার ধর্ম সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকলে, এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা অসম্ভব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে গঙ্গার উপর বিশ্ববিখ্যাত যে হাওড়ার সেতু রয়েছে, সেটি একটি উন্নত ধরনের 'ক্যান্টিলিভার' (double cantilever) সেতু এবং এর গঠন প্রণালী ও কার্যকারিতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আছে ঐ সেতুর উপাদানের স্থিতিস্থাপক ধর্মের উপর।

সবশেষে, স্থিতিস্থাপকতার ধর্ম অনুসারে নীচের সিদ্ধান্তগুলি সামগ্রিকভাবে করা যেতে পারে :—

(ক) কঠিন বস্তুর আয়তন স্থিতিস্থাপকতা, কাঠিন্য গুণাঙ্ক ও ইয়ং গুণাঙ্ক আছে।

(খ) তরলের সামান্য আয়তন স্থিতিস্থাপকতা আছে কিন্তু অনুদৈর্ঘ্য স্থিতিস্থাপকতা বা মোচড় স্থিতিস্থাপকতা নেই।

(গ) গ্যাসের সংনমনশীলতা (compressitity) কঠিন বা তরল পদার্থের চেয়ে অনেক বেশী। গ্যাসের দু'রকম স্থিতিস্থাপকতা আছে।

(i) সমোষ্ণ স্থিতিস্থাপকতা (isothermal elasticity) ও (ii) রুদ্ধতাপ স্থিতিস্থাপকতা (adiafatic elasticity) এর মধ্যে সমোষ্ণ স্থিতিস্থাপক আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক, গ্যাসের প্রাথমিক চাপের মানের সমান কিন্তু রুদ্ধতাপ স্থিতিস্থাপক আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক গ্যাসের প্রাথমিক চাপের চেয়ে a গুণ বেশী হয় ও যেখানে a হ'ল, গ্যাসের দুই আপেক্ষিক তাপের অনুপাত।

স্থিতিস্থাপকতা ও তার ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা এক বিশাল ব্যাপার, তবুও পদার্থের এই গুরুত্বপূর্ণ এক সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে অল্পপরিসরে সামান্য আলোচনার সাহায্যে, এই ধর্ম বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা আশাকরি কার্যকরী হবে।

গুরু-শিষ্য কল্যাণ মৈত্র

শীত কাল। একদল সহযাত্রী ইতালি থেকে চলেছে সুইজারল্যাণ্ডের দিকে। অল্প দূরত্বে চলেছেন একজন যুবক। যুবকটির নাম হ'ল জিওর্দানো ব্রুনো। 1548 সালে ইতালির একটি ছোট শহর নেলোয় ব্রুনোর জন্ম। সেকালে শিক্ষার জন্য মঠবাসীদের কাছে আবেদন করতে হত। প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হত ধর্মগ্রন্থ দিয়ে। ক্যাথলিক মঠবাসী ডমিনিকানদের ব্রুনো বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ দ্বারা অবাক করে দেন। পরে তিনি যাজক হন। একদিন মঠের লাইব্রেরী থেকে অতি পুরোনো একটা বই পেলেন। ল্যাটিন ভাষায় নিকোলাস কোপের্নিকাসের লেখা। গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে লেখা। কোপের্নিকাসের বইটির তথ্য বাইবেল বিরোধী ছিল। ধর্মযাজকেরা নিকোলাসকে শত্রুর মতো দেখতো। কিন্তু নিকোলাসের লেখা পড়ে ব্রুনো অভিভূত হলেন। তাঁকে গুরু বলে মেনে নিলেন। মঠবাসীরা জেনে ফেললো ব্রুনোর কথা অচিরেই। ব্রুনোও শুনলেন আসন্ন শাস্তির কথা। তাই স্বদেশ ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন সুইজারল্যাণ্ড গামী যাত্রীদের সাথে।

ব্রুনো সাহসের সাথে বলেছিলেনঃ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে অনেক গ্রহ। পৃথিবী ও সূর্য নিজের অক্ষে ঘোরে। খৃষ্টধর্মমতে বিশ্বজগৎ অবিনশ্বর। কিন্তু ব্রুনো বললেন বিশ্বজগতের শুরু ও শেষ আছে। ফলে ব্রুনোকে চার্চ পরম শত্রু বলে ধরে নিল। ফলে স্বদেশে-বিদেশে তাঁর বাস বন্ধ হল। ব্রুনো তাই পথ পরিক্রমা শুরু করলেন। শোনাতে লাগলেন বিশ্ববাসীকে তাঁর কথা। অনাবিষ্কৃত অনেক গ্রহের কথা।

ধর্মের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযুক্তকে নির্যাতনের জন্য ইতালি ও স্পেনে যে নিষ্ঠুর বিচার সভা বসতো তাকে ইনক্যুইজিশান বলা হত। ইতালীয় ব্যক্তি জিওভানি মচেনিগেকে সরল মনে বিশ্বাস করে দেশে ফিরলেন ব্রুনো। মচেনিগেকে চিনতে ব্রুনোর ভুল হয়। বেইমানি করে মচেনিগো ইনক্যুইজিশানকে সহায়তা করলো। তারপর দীর্ঘ আট বছর ব্রুনো জেলের নরক যন্ত্রণা ভোগ করলেন। অবশেষে ইনক্যুইজিশানের রায়ের ভিত্তিতে 1600 সালের 17ই ফেব্রুয়ারী ব্রুনোকে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

*   *   *

ব্রুনোর গুরু কোপের্নিকাস ছিলেন পোলিশ শহরের লোক। গির্জা পরিষদের সভ্য ও যাজক ছিলেন কোপের্নিকাস। ব্রুনোর গুরু এই মহান বিজ্ঞানীর কথা বলার আগে চট্ ক'রে সেই সময়কার (1473) লেখাপড়ার ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে বলে নি। সেই সময়ে ভি আই পি ছিলো যাজকরা। যাজকরাই ছিল শিক্ষিত। তাদের ছেলে-মেয়েরাই শিক্ষার আলো পেত। এখনকার দিনে যেমন স্কুল, কলেজ তখন ছিল গির্জা। গির্জার তারা অনেক কাজ করতো ; চিঠিপত্র বিনিময়। ধর্মগ্রন্থ নকল প্রভৃতি ছিল মুখ্য কাজ।

আসলে যাজকরাই রাজার সবরকম কাজ দেখাশোনা করতো। রাজারা প্রায়ই একদম ক-অক্ষর-গো-মাংস ছিলেন। ভালো ছাত্র মানেই যাজক। আর তখন পেশাদার যাজকই কেবল বিজ্ঞান পড়তেন। নিকোলাসের বাবা ছিলেন রুটিওয়ালা। তাঁর কাকা নিকোলাসকে বিলাতে পাঠান অধ্যয়নের জন্য। কোপের্নিকাসের পুরো নাম নিকোলাস কোপের্নিকাস (1473-1543)। কি বিষয়ে পড়েন নি ? ধর্মতত্ত্ব—গুলে খাওয়া যেন। চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্বে। টেকনোলজি ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সুদক্ষ। একবারে ভার্সেটাইল জিনিয়াস। কোপার্নিকাস দেশ ভক্ত ছিলেন। জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেন। ডাক্তার হিসাবে তাঁর নাম ডাক ছিলো। গরীবদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন। মাঝে মাঝেই তাঁকে সন্ধ্যার সময় খুঁজে পাওয়া যেত না। পাওয়া যাবে কি করে ? তিনি সন্ধ্যা হলেই ছাদে—অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে গ্রহদের নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতেন। আজকের মতো দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না। তাই খালি চোখে গবেষণা করতে হত। ফ্রমবোর্ক ক্যাথিড্রালের দেওয়ালের একটি গম্বুজের ছাত ছিলো তার গবেষণাগার। রাতের পর রাত এই গবেষণাগারে চলছে সাধনা। গরম শীত বৃষ্টি তাঁর গতিকে রুদ্ধ করতে পারে নি। পোল্যাণ্ডের Cracow ও ইতালীর বোলোগনা এবং পাদুয়া থেকেই তিনি কলেজী শিক্ষা গ্রহণ করেন। অ্যাসট্রোনমি ও অঙ্ক ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। 1505 সালে তিনি ফ্রমবোর্ক (পোল্যাণ্ড) ক্যাথিড্রালে প্রত্যাবর্তন করেন। যাজকের পদে আসার ফলে

সারা জীবনে পয়সার অভাব ছিলো না। ইতালীতে থাকার সময়ই তিনি অ্যালমাগেস্টের ভুলগুলি ধরতে পারেন।

কোপের্নিকাস বিশ্বাস করেছিলেন সূর্য ও তারাগুলি স্থির। গ্রহগুলি বৃত্তাকারে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। দীর্ঘ 31 বছর সাধনার পর 1529 সালে তিনি কমেন্টারিওলাস নামে তাঁর বিখ্যাত বই প্রকাশ করেন। কোপের্নিকাস বললেন, সূর্যের বাৎসরিক পরিভ্রমণ যা পৃথিবী থেকে দেখা যায় তার কারণ হল পৃথিবীর গতি। কিন্তু টলেমীর মতে পৃথিবীর গতি অবাস্তব। টলেমী বলেছিলেন গ্রহগুলি উপবৃত্তে ঘোরে। কোপের্নিকাস বৃত্তাকার পথের কথা বললেও তিনি সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। আসলে কোপের্নিকাস কল্পনাও করতে পারেন নি যে বৃত্তাকার পথ ছাড়াও ঘুরতে পারে। কোপের্নিকাস বিশ্বাস করতেন বিশ্বজগতের স্থির কেন্দ্র পৃথিবী নয়। পৃথিবীর একটা কেন্দ্র নয় যার জন্য গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছে।

বহু বছর চার্চের নির্যতেনের ভয়ে তাঁর আবিষ্কারের কথা চেপে ছিলেন তিনি। চার্চের কর্তৃপক্ষরা প্রথমে তাঁর কথার গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি। তিনি যাজক হয়ে মঠের বা গির্জার ক্ষতি করতে পারেন তাঁরা তা ভাবেন নি। তাই বইটি সবাই পড়তো। ফলে সারা বিশ্বে বিশেষতঃ ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর আবিষ্কৃত নবতত্ত্ব ছড়িয়ে পড়লো। নির্যাতনের হাত থেকে দুটি কারণে বাঁচলেন কোপের্নিকাস। প্রথমটি যাজকরা তাঁকে অগাধ বিশ্বাস করতেন। অন্যটি হল তিনি সে বছর দেহত্যাগ করেন (1543) সেই বছর তাঁর বই রিভোলিউক্যানিবাস প্রকাশিত হয়।

মৃত্যু শয্যায় এক পলক তাঁর বইটির এক কপি তিনি দেখেন। তাঁর মৃত্যুর পরেই ধর্ম যাজকরা তাঁর গবেষণার অর্থ বুঝতে পারেন না। ফলে তাঁর বইটি নিষিদ্ধ করা হয়। প্রায় 300 বছর পর রোমান চার্চ ঘোষণা করেন সে বিশ্বজগতের তুলনামূলক জ্যোতির্চর্চার জন্য কোপের্নিকাসের বইটি পড়া যেতে পারে। ব্রুনো কোপের্নিকাসের তত্ত্ব সাহসের সাথে প্রচার করেন—তাই তাঁকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। কোপের্নিকাসের ভাগ্য ভালো ছিলো তাই সেরকম হয় নি।

Serampore, Hooghly.

আধুনিক বিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর অগ্রগতিতে আমরা বিস্মিত হলেও কতটুকু জানি সেই আবিষ্কারের পিছনের ইতিহাস ?

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের

আবিষ্কারের পিছনে ১২৲

সন্ধানী

২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

খুব ছোটদের জন্য ক্যুইজের বই

সাংবাদিক বরুণ মজুমদারের

সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট

ছয় থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য

প্রতি খণ্ড ৮ টাকা ।। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড একত্রে ২০ টাকা

রঞ্জন প্রকাশন ।। ৮ ১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩

ল্যাবোরটারির নয়, বিজ্ঞানকে যাঁরা ঘরের জিনিস করে নিতে চান তাঁদের জন্যে জ্ঞান বিচিত্রা একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজ্ঞান মাসিক পত্রিকা।

ত্রিপুরা থেকে গত এক যুগ ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে নিয়মিত।

● নতুন গ্রাহক ও এজেন্সী দেওয়া হচ্ছে।

জ্ঞান বিচিত্রা

10 জগন্নাথ বাড়ী রোড,

আগরতলা-১

ছোটোদের সচিত্র এনসাইক্লোপিডিয়া

ছোটদের বিশ্বকোষ

সম্পাদক

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ।। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

৬ খণ্ডে সমাপ্ত ।। পুরো সেট ১৯০·০০

মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ

১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কল-৭৩

ঘরের চালে নরমুণ্ড

কত ধরনের মানুষ ছড়িয়ে আছে পৃথিবীতে, আর তাদের কতই না বিচিত্র ঘরবাড়ি। বালি দ্বীপের পয়সাঅলা মানুষেরা তাদের বাঁশ আর কাঠের তৈরি বাড়ির মাথায় শস্য সঞ্চয় করে রাখেন। ব্যাপারটা ভাবলেই কেমন যেন মজা লাগে, তাই নয়! প্রায় 50 ফুট উঁচু চালের ওপর সাজানো থাকে মোষের সিং। আর এর সঙ্গে মানানসই বিশাল বিশাল সমুদ্র-শামুকের খোলা রাখা হয় সাজিয়ে। অনেক, অনেক আগে এই বিরাট বিরাট সমুদ্র-শামুকের খোলার বদলে চালের মাথায় মোষের শিঙের পাশাপাশি রাখা থাকত নরকংকালের করোটি। এটা দেখেই বুঝতে পারত সবাই—এ বাড়ি কোনো যোদ্ধার।

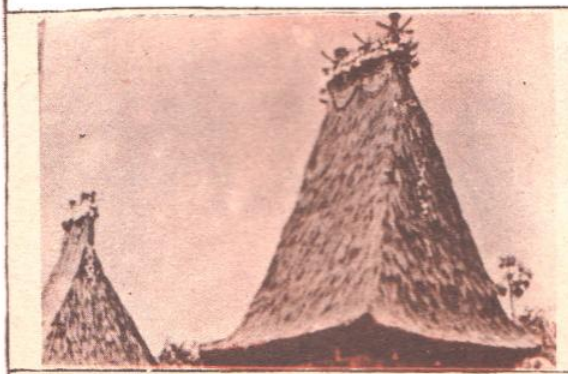

চলে গেছে সে সব দিন। নরমুণ্ড শিকারী যোদ্ধারাও ইদানীং নিরুদ্দেশ। আইন, প্রশাসন ও সময় তাদের শেষ করে দিয়েছে।

বালি দ্বীপের চওড়া মতো এইসব বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে মাটি থেকে বেশ উঁচু কাঠের পাটাতনের ওপর। বাড়িতে দরজা-জানালার কোনোই অভাব নেই। আর দরজা-জানালা বেশ বড়সড়ও। প্রায় পাহাড়ের মতো উঠে যাওয়া ছাদ এ বাড়ির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মানুষজন এ সব বাড়িতে থাকেন বেশ স্বচ্ছন্দেই। ঘরের চালে মোষের শিঙের পাশাপাশি বিশাল সমুদ্র-শামুকের খোলা সাজিয়ে এঁরা এখনও স্মরণ করেন সেই অতীতকে। সে সময় নরমুণ্ড শিকার এবং তা এনে ঘরের ছাদে ঝুলিয়ে দেয়ার রীতি ছিল নিয়মিত ঘটনা এবং বীরত্বচিহ্ন।

Xhosaদের ঘর

দক্ষিণ আফ্রিকার xhosaদের ঘর হয় পাহাড়ের কাছাকাছি। গোলগাল দেখতে এই ঘর বলতে গেলে একেবারেই সাদামাটা। সাধারণভাবে দেয়া মাটির দেয়াল, তার ওপর প্রাকৃতিক রং। তাও নেহাতই শাদা, কোথাও কোনো রঙিন কারু-কাজের বাহার নেই। xhosa মেয়েরা কাজ করে তরকারি বাগানে। ঘরের দরজা বলতে একটাই। মাথায় টুপির মতো ছাদ। ছবিতে এ ঘর দেখলে মনে পড়ে যেতে পারে আমাদের দেশ-গাঁয়ের শস্য-গোলার কথা। xhosa মানুষেরা ক্রমশ নেমে এসেছে দক্ষিণে। তারা এখন যে অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে, তার নাম ট্রান্সকেই।

Xhosaরা পাহাড়ের উপত্যকাকে বেছে নিয়েছে চাষের জমি হিসেবে। সেখানেই তাদের চাষবাস। জমিতে বুনো আগাছার ঝোপ-জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেয় মেয়েরা। তারপর সেই ঝোপ জঙ্গল আগুনে পুড়ে সাফ হয়ে গেলে সেখানে নতুন চাষবাস হয় শুরু। আফ্রিকার এই অঞ্চলের জমি এমনিতেই তেমন উর্বর নয়। দু বছর, বড় জোর তিন বছর ফসল ফলানো যায় এই পদ্ধতিতে।

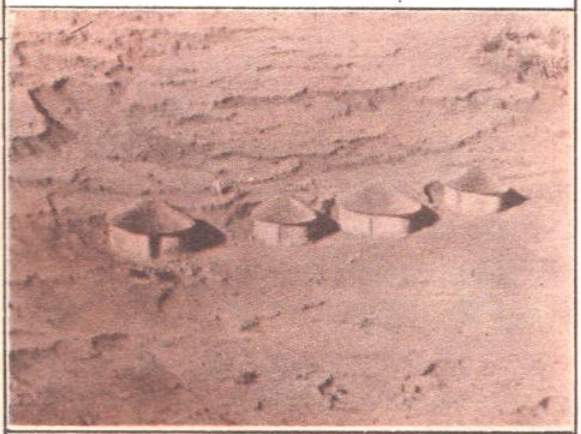

পাহাড়ি বিজন ভূমিতে xhosaদের ঘর এক সারিতে চারটি বা পাঁচটি থাকে। দূর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে তাঁবুর সারি। বুঝিবা কোনো যাযাবর দল থমকে দাঁড়িয়ে গেছে পাহাড়ি উপত্যকায়।

কিন্নর রায়

চিতল

অজয় হোম

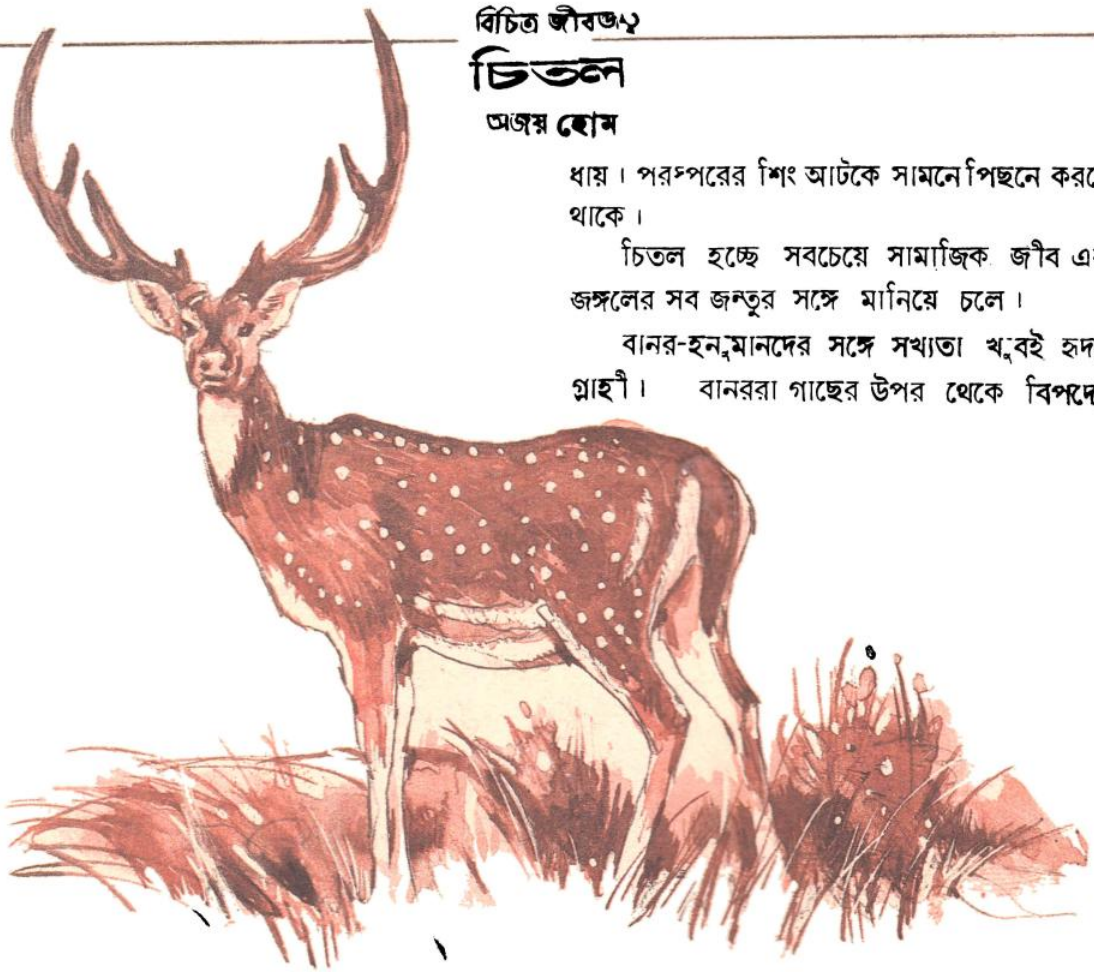

ভারতে যত হরিণ আছে তার মধ্যে বোধ হয় চিতল সবচেয়ে স্বাভাবিক সৌষ্ঠব-পূর্ণ প্রাণী এবং সবচেয়ে বড়োর মধ্যেও একটি। শরীর লালচে চামড়ার উপর সাদা ছিটে ভরা।

ভিজে এবং শুকনো পাতাঝরা গাছের জঙ্গলের বাসিন্দা। অন্যান্য ভারতীয় হরিণের চেয়ে এরা কম রাত্রিচর। বেশ বেলা পর্যন্ত এবং বিকেলের আগে পর্যন্ত চরে। চিতলের শিঙের মধ্যে একটা রাজকীয় ভাব আছে। এই শিং লালচে-পাটকিলে এবং লম্বায় 95 সেমি এবং 12 সেমি মোটা। এই শিং শুধু পুরুষদেরই হয়। বেশির ভাগ হরিণই তার শিং ফেলে দেয় আগস্টেই এবং বর্ষার শেষে আবার গজাতে শুরু করে।

পুরুষ স্ত্রীজাতির জন্যে প্রায়ই লড়াই করে। দুটি পুরুষ মাথা নিচু করে পরস্পরের দিকে ধায়। পরস্পরের শিং আটকে সামনে পিছনে করতে থাকে।

চিতল হচ্ছে সবচেয়ে সামাজিক জীব এবং জঙ্গলের সব জন্তুর সঙ্গে মানিয়ে চলে।

বানর-হনুমানদের সঙ্গে সখ্যতা খুবই হৃদয়-গ্রাহী। বানররা গাছের উপর থেকে বিপদের আশঙ্কা অনেক আগেই টের পায়। টের পেলেই চিতলদের সাবধান করার জন্যে ডাক ছাড়ে।

চিতলদের ভিতরেও বিপদাশঙ্কার একটা সংকেত আছে। বিপদাশঙ্কায় চিতল দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, গলা লম্বা করে বাড়িয়ে কান খাড়া করে খোঁজে কোনদিকে বিপদের আশঙ্কা যখন বিপদ বেশ নিশ্চিত, হরিণ তার লেজটি তুলে পিছনের সাদা অংশ দেখায়। সেই সঙ্গে সামনের একটি পা মাটিতে বেশ জোরে ঠোকে এবং মুখে খুব জোরে উচ্চৈস্বরে ডাক দিতে থাকে।

চিতলরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে খেলায় মাতে। তাতে ধাড়িরাও যোগ দেয়।

যেসব জায়গায় চিতল দেখা যায় না, সেইসব জায়গায় এদের ছাড়া হোক। এর একমাত্র কারণ এদের স্বর্গীয় সৌন্দর্যের জন্যে। কিন্তু এইসব উদ্যোগ বেশির ভাগ সময় সফল হয় নি।

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

ক্যুইজ কনটেস্ট

আগস্ট '৪৪ VII VIII গ্রেড-I

1. [illegible] ভারতের একটি নামকরা প্রতিষ্ঠানের প্রতীক। এই প্রতিষ্ঠানের নাম কি ?

2. পৃথিবীর [illegible] গতিবেগ কোথায় সর্বাপেক্ষা [illegible] ?

3. ওয়ার্হাবি [illegible] হয় কোন দেশে এবং কোন শতকে ?

4. বেলজিয়ামের সরকারী [illegible] নাম কি ?

5. বিশ্বে সর্বপ্রধান কফি [illegible]-কারক দেশ কোন্‌টি ?

6. বাংলাদেশের জাতীয় ফুল কি ?

7. [illegible] হৃদপিণ্ডে [illegible] সংখ্যা কত ?

8. [illegible] ক'টি পা আছে ?

9. [illegible] স্তন্যপায়ী প্রাণীর [illegible]

10. [illegible] কোনটি ?

গ্রেড II

ক্যুইজ কনটেস্ট

আগস্ট '৪৪ IX—X

গ্রেড—II

1. একটি পঁচিশ ওয়াট ল্যাম্প কত ঘণ্টা জ্বালালে এক ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে ?

2. এক গ্রাম হাইড্রোজেনের মধ্যে অণুর সংখ্যা কত ?

3. প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় 11.2 লিটার একটি গ্যাসের ওজন 14 গ্রাম। গ্যাসটির আণবিক গুরুত্ব কত ?

4. সমান দৈর্ঘ্যের দুটি তামার তারের মধ্যে একটির ব্যাসার্ধ অন্যটির দ্বিগুণ। তার দুটির রোধের অনুপাত কত ?

5. এই মাছটির নাম কি ?

6. কোন নদীর তীরে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা এবং হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্ট অবস্থিত ?

7. অক্সিজেনের পরমাণু ক্রমাংক কত ?

8. কোন্ শতাব্দীতে কুতুব মিনার [illegible] হয়েছিল ?

9. '[illegible] অরগ্যান' কে আবিষ্কার করেছিলেন ?

10. সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান [illegible] উৎপাদক রাজ্যের নাম কি ?

গ্রেড III

ক্যুইজ কনটেস্ট

আগস্ট '৪৪ XI—XII

গ্রেড—III

1. ইণ্ডিয়ান ড্রাগস্ অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের অধীনে বর্তমানে পাঁচটি কারখানা আছে। এদের মধ্যে একটি হৃষীকেশ-এ অবস্থিত। ঐ কারখানায় কি কি ওষুধ তৈরি হয় ?

2. পঞ্চশস্য কি ?

3. পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোথায় অভয়ারণ্য আছে ?

4. যে সব প্রাণী প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ খাদ্য খায় তাদের কি নামে অভিহিত করা হয় ?

5 যে সব প্রাণী শুধু ফল খায় তাদের কি বলে ?

6. এমন কোন ফল আছে কি, যার বৃতি আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকি ? তার নাম কি ?

7. এক গ্রাম পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে আইনস্টাইনের সূত্রানুসারে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ কত হবে।

8. এক ফের্মি = কতো সেণ্টিমিটার ?

9. তিনটি বলের মান, দিক ও ক্রিয়ারেখা কোন ত্রিভুজের বাহু তিনটির দ্বারা নির্দেশিত হলে, বল তিনটি কিরূপ অবস্থায় থাকবে ?

10. এই ফুলের নাম কি ?

পুলিনবিহারী সাউ

সূত্র ঃ—

পাশাপাশি ঃ—1. যে প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম – Hayana cabalbus sp. 2. যে পাখির বিজ্ঞানসম্মত নাম—Acridotheres tristis. 5. যে কীটের বিজ্ঞানসম্মত নাম—Componotus compressus. 8 যে মাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম —Hilsa ilisha. 9. যে মাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম—Clarias batrachus.

উপর-নিচ ঃ—1. যে প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম—Scoliodon Sarrakowat. 2. যে প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম –Chelone Sp. 4. যে কীটের বিজ্ঞানসম্মত নাম –Oecephyla Smaragdynaa. 6. যে পাখির বিজ্ঞানসম্মত নাম – Passer domesticus. 7. যে প্রাণীর বিজ্ঞানসম্মত নাম – Canis flamiliaris.

c/o এইচ ডি সাউ, ইন্দা বোসপাড়া
খড়্গপুর, মেদিনীপুর, 721305

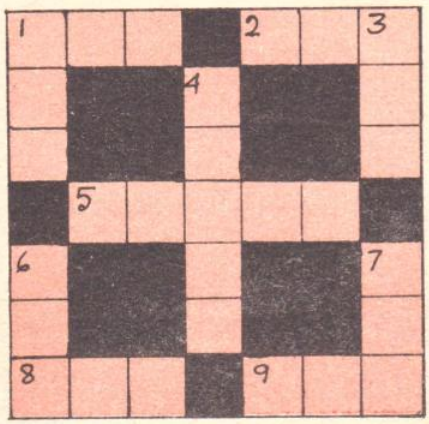

আই কিউ টেস্ট

আই-কিউ-টেস্ট—আগস্ট 88

1. কোন দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে স্ট্যাচু অব্ লিবার্টি উপহার দেয়—' (a) ইটালী, (b) ফ্রান্স, (c) গ্রেটব্রিটেন। কোন সংখ্যাটি খাপছাড়া—8, 16, 24, 32, 40, 48, 58, 64 2. 'মীরা বেন' কার শিষ্যা ছিলেন — a) জয়প্রকাশ নারায়ণ, (b) মহাত্মা গান্ধী, (c) বিনোবা ভাবে. (d) আনন্দময়ী মা। 3. A এবং B একই জায়গা থেকে পরস্পর বিপরীত দিকে হাঁটতে শুরু করল। A 3 কি. মি এবং B 4 কিমি গেল। তারপর A ডান দিকে ঘুরে 4 কি. মি. গেল এবং B বাঁদিকে ঘুরে 3 কি.মি. গেল। এখন তারা যাত্রাস্থল থেকে কত দূরত্বে থাকবে? 4. দৃশ্যমান বর্ণলীতে ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বর্ণটি হচ্ছে—(a) হলুদ, (b) লাল, (c) নীল, (d) বেগুনী।

জুন, 88 VII-VIII গ্রেড-I

1. বারোটি। 2. 687 দিন। 3. কার্বন। 4. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। প্রকাশক ঃ 'ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড। 5. Liberty, equality, fraternity. 6. নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। 7. স্বাভাবিক উষ্ণতায় তরল পদার্থ হলো ব্রোমিন। 8. আমাজন অববাহিকার নিবিড় অরণ্য। 9. রজনীগন্ধা 10. ভিলওয়াড়া কাপড় প্রস্তুতকারক সংস্থার প্রতীক।

জুন, 88 IX-X গ্রেড-II

1. পুরাতন পলিমাটি। 2. পশ্চিম জার্মানীর 'কলুন ক্যাথিড্র্যাল, 3. স্বামী দয়ানন্দ। 4. হাজি শরিয়ৎ উল্লাহ। 5. বাংলার কুটীর শিল্পের প্রতীক বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া। 6. স্পেন, পর্তুগল ফ্রান্সে ও ইটালিতে। 7. সরাবতী প্রকল্প। 8. আইসল্যাণ্ড স্পার। 9. উদ্ভিদ হরমোন 'অক্সিন' এর রাসায়নিক প্রকৃতি হলো' ইনডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড।' 10. জুনপুট এ।

জুন, 88 (XI-XII) গ্রেড-III

1. গুঁড়িকন্দ (Corm) 2. Bengene hexachloride 3. ডিম থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তিকেই মেটামরফোসিস বলে, 4. মাণ্ডবী। 5. প্রমথ চৌধুরী। 6. হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ। এর আবিষ্কর্তা হলেন হ্যারল্ড ইউরে। 7. এক লিগ। 8. চার্নকাইট। 9. কারণ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির সহায়ক পদার্থরূপে এইসব মৌলগুলি অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। 10. উভয়েই বৈদ্যুতিক মোটর।

আই কিউ টেস্ট সমাধান

আই-কিউ-টেস্ট –'88 জুন-এর সমাধান

1. 11। 2. (c) আয়রন ও ক্যাথোড রশ্মির দ্বারা। 3. (c) জম্মু ও কাশ্মীর। 4. (c) মাথা, (d) হৃদপিণ্ড, (b) গোড়ালি, (a) পায়ের আঙুল। 5. (e) কাগজ। বাকীগুলি পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য।

শব্দকূট সমাধান

বলতে পারো কেন ?

সুধাংশু পাত্র

গত মাসের নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর।

ব্লিচিং পাউডার জীবাণুনাশক হিসাবে কাজ করার কারণ কী ? এটি মানুষের কী কোন ক্ষতি করে না এবং এর ফরমূলা কী ?

উ: ব্লিচিং পাউডারকে যেহেতু কলিচুনের উপর শুষ্ক [illegible] দ্বারা তৈরি করা হয় এবং উৎকৃষ্ট ব্লিচিং পাউডার [illegible] প্রায় 40% ক্লোরিন পাওয়া যায় তাই ওকে বিরঞ্জক ও জীবাণুনাশক উভয় কাজেই ব্যবহার করা হয়। জলের [illegible] হয়ে যে হাইপোক্লোরেট উৎপন্ন করে (ca[illegible]) [illegible] রয়েছে বিরঞ্জন গুণ ও জীবাণুনাশক ক্ষমতা। ওর দ্বারা জীবাণুরা নষ্ট হয় এবং অল্প হলেও মানব দেহে ক্ষতিকরক্রিয়া থাকার কথা। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে সে ক্ষতিকে উপেক্ষা করা যায়।

ব্লিচিং পাউডারের আনুমানিক সংকেত Ca(ocl)cl। কোন কোন রসায়নবিদের মতে ব্লিচিং পাউডার একটি মাত্র যৌগিক পদার্থ নয়—একাধিক যৌগিক পদার্থের মিশ্রণ।

এ মাসের প্রশ্ন

হাসি পায় কেন ?

জানতে চেয়েছে সন্তু বিশ্বাস, পলাশীপাড়া, নদীয়া থেকে।

অন্যান্য প্রশ্ন ও উত্তর

প্র: [illegible] কী ? রবীন কুমার জানা, চড়াইখ[illegible]-[illegible]-[illegible]নীপুর।

উ: [illegible] এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কোন কণা [illegible] নিউক্লিয়াসকে আঘাত করলে মেসন নামের [illegible] মৌলিক কণা লাভ করা যায়। মেসন [illegible] ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। "পাই" মেসন, "মিউ" [illegible] এদের ভর ইলেকট্রন থেকে প্রোটনের মধ্যে। [illegible] গেছে. এরা ধনাত্মক, ঋণাত্মক, [illegible] হতে পারে। এদের অস্তিত্ব পরীক্ষার সাহায্যে [illegible] এদের সম্বন্ধে বহু তথ্য [illegible]

প্র: [illegible] পাল, বর্ধমান।

উ: মেণ্ডেলিয়েভের [illegible] লক্ষ্য কর, VIII শ্রেণীতে কোন উপশ্রেণী নেই [illegible] দ্বিতীয় ও তৃতীয় দীর্ঘ পর্যায় গুলিতে ঐ [illegible] করে মৌলিক পদার্থকে পাশাপাশি এক একটি ঘরে স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রথম ঘরে আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল (Fe. Co. Ni) ; দ্বিতীয় ঘরে বুথেনিয়াম, রোডিয়াম, প্যালাডিয়াম (Ru, Rh, Pd) ; তৃতীয় ঘরে অসমিয়াম, ইরিডিয়াম, প্লাটিনাম (Os, Ir, Pt)। এদেরই বলা হয়ে থাকে সন্ধিগত [illegible] মৌল বলার কারণ, এই ত্রয়ী মৌল গোষ্ঠী একটি লম্বা পর্যায়ের পরে এবং আর একটি লম্বা পর্যায় শুরু হওয়ার আগে সংযোগ সেতুরূপে কাজ করে। পূর্বের গুলি তীব্র তড়িৎ ঋণাত্মক (VIIB) এবং পরেরগুলি তীব্র তড়িৎ ধণাত্মক (1A)। এরা তাই বিপরীত তড়িৎ ধর্মী মৌলের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে। তাই ওদের বলা হয় সন্ধিগত অথবা সরনান্তর (Transitional) মৌল।

প্র: আইসোবারস্ ও আইসোটোপস্ কী ? পুলিনবিহারী সাউ-ইন্দা, খড়্গপুর।

উ: সমান পারমানবিক ওজনের বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আইসোটাপ সমূহ অর্থাৎ বিভিন্ন মৌলেরসমগোত্রীয় ও সমান ওজনের আইসোটোপ সমূহকে বলে আইসোবারস। বাংলায় বলে সমভর। এদের পারমাণবিক সংখ্যা বা অ্যাটমিক নাম্বার বিভিন্ন কিন্তু আই সোটোপিক ওয়েট সমান।

যেমন আয়নন, পটাসিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের 40 পারমাণবিক ওজনের পরমাণু পাওয়া যায়। কিন্তু মৌলগুলির পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 18, 19 ও 20। এদের সংকেত $18A^{40}$: $19K^{40}$; $20Ca^{40}$। তেমনই পাওয়া যায় টিন ও ইণ্ডিয়ামের $50Sn^{11}$, $49In^{115}$। জিংক ও নিকেলের $28Ni^{64}$ ও $30Zn^{64}$ ইত্যাদি।

অপর দিকে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে সমান সংখ্যক নিউট্রন

থাকলে কিন্তু অ্যাটমিক নাম্বার বা পারমাণবিক সংখ্যা পৃথক হলে বলা হয় সেই মৌল সমূহের আইসোটোপ।

প্রঃ মেণ্ডেলিফের পর্দায় সারণীর অসঙ্গতিগুলি কি কি? মৃত্যুঞ্জয় ধাওয়া, শুভরআড়া-হাওড়া।

উঃ মেণ্ডেলিফের পর্দায় সারণীর প্রধান প্রধান অসঙ্গতি হল—(1) নাইড্রোজেনের স্থান—হাইড্রোজেনকে প্রথম শ্রেণীতে ক্ষারীয় ধাতু অথবা সপ্তম শ্রেণীর হ্যালোজেনের সঙ্গে দুভাবে স্থান দেওয়া যায়। কারণ, দুটি শ্রেণীর মৌলের সঙ্গেই হাইড্রোজেনের ধর্মের সাদৃশ্য আছে। তাই, পর্যায়-সারণীতে হাইড্রোজেনের সুনির্দিষ্ট স্থান নির্দেশ করা সম্ভব নয়। হাইড্রোজেন একযোজী অধাতব মৌল হওয়া সত্বেও ধাতুধর্মী এবং ইলেকট্রো-পজিটিভ, বিজারক দ্রব্য এবং স্থায়ী অক্সাইড গঠন করতে পারে বলে এর ধর্মে প্রথম শ্রেণীর ক্ষারকীয় ধাতুর ধর্ম বিদ্যমান। অপরপক্ষে হাইড্রোজেন সপ্তম শ্রেণীর হ্যালোজেনের ন্যায় গ্যাসীয় পদার্থ, অণু দুই পরমাণু বিশিষ্ট এবং একযোজী অধাতু ও সমসংখ্যক ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন হ্যালোজেনের মত জারকধর্মী নয়। (2) বিরল মৃত্তিকা মৌল চৌদ্দটি এবং এদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় তাদের একত্রে পর্যায়সারণীর একটি মাত্র ঘরে স্থান দেওয়া হয়েছে। এটি কিন্তু পর্যায়সারণীর মৌলক্রমের পরিপন্থী (57 থেকে 71 ল্যানথানাইড সমূহ। (3) পর্যায়ক্রমের অসঙ্গতি—নিম্নতর ওজন থেকে উচ্চতর মৌলগুলোকে পরপর সাজিয়ে পর্যায় সারণীর কাঠামো তৈরি করা হয়। কিন্তু দেখা যায়, আর্গন (39·94) ও পটাসিয়াম (39·1); কোবাল্ট (58·96) ও নিকেল (58·69); আয়োডিন (126·91) ও টেলুরিয়াম (131·12); ইত্যাদি কয়েক জোড়া মৌলের ক্ষেত্রে নিম্নতর পারমাণবিক ওজনেও মৌল উচ্চতর পারমাণবিক ওজনের পূর্বে থাকে। (4) সোডিয়াম ও ব্রোঞ্জ, ক্লোরিন ও ম্যাঙ্গানিজ, ভিন্নধর্মী হওয়া সত্ত্বেও একই শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হয়েছে। অপর পক্ষে তামাও পারদ সমধর্মী হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে। (5) অষ্টম শ্রেণীর একই পংক্তিতে আয়রণ, কোবাল্ট ও নিকেল—এই তিনটি মৌলকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এতে সন্ধিগত মৌল সম্বন্ধে মেণ্ডেলিফের তখন অস্পষ্ট ধারণাই ছিল বলে মনে করা হয়। (6) পর্যায়সারণীতে বিভিন্ন মৌলের আইসোটোপের স্থান দেওয়া সম্ভব নয় এবং (7) পর্যায়-সারণীর দ্বারা পরমাণু সমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস ব্যাখ্যা করা যায় না।

প্রঃ নেপচুন গ্রহের আবিষ্কারক কে? রজত পাল, টেলেরোড, কাছাড়-আসাম।

উঃ নেপচুন আবিষ্কারের পেছনে অনেকেরই অবদান আছে। তাই এর আবিষ্কারের কাহিনীটুকুও সংক্ষেপে বলতে হয়।

হার্সেল কর্তৃক আকস্মিকভাবে একদিন ইউরেনাস আবিষ্কৃত হলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্য থেকে ইউরেনাসের দূরত্ব এবং গ্রহটির গতিবেগ কত—এ নিয়ে অঙ্ক কষতে এবং পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। দুভাবে নির্ণয় করা গতির মধ্যে গরমিল হওয়ায় বিজ্ঞানীরা চিন্তান্বিত হয়ে ওঠেন এবং তখনই তাঁদের মনে আসে, যদি অজ্ঞাত কোন গ্রহের আকর্ষণ ইউরেনাসের উপর পড়ে থাকে তাহলেই গাণিতিক পদ্ধতির গরমিল হতে পারে—নচেৎ নয়।

এরপর বিজ্ঞানীরা গাণিতিক পদ্ধতিতে অজ্ঞাত এই গ্রহটির অবস্থান, ইউরেনাস থেকে কতখানি দূরত্বে থাকা উচিত, ইত্যাদি নির্ণয় করতে সচেষ্ট হলেন। শেষে বৃটিশ-বিজ্ঞানী আডামস্‌ই অঙ্ক কষে ঘোষণা করেন, ইউরেনাসের পর আরও একটি গ্রহ আছে।

এবার গ্রহটিকে অনুসন্ধান করার পালা। কিন্তু কেন জানা যায় না, অ্যাডামস নিজে অনুসন্ধান না চালিয়ে তাঁর পরিচিত এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী চ্যালিসকে অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ জানালেন। চ্যালিস সহজে সম্মত হলেন বটে, কিন্তু হাতের কাছে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রাদির ভাল নকসা না থাকায় প্রথমে কেম্ব্রিজ মানমন্দিরে গিয়ে নক্সা প্রস্তুত করতে শুরু করলেন।

এদিকে ল্যাভেরিয়ে নামে জনৈক ফরাসী বিজ্ঞানী অ্যাডামসের মতই অঙ্ক কষে নতুন গ্রহটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন এবং বার্লিনের এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী "গাল" এর উপর অনুসন্ধানের ভার দেন।

"গাল" শুরু করেন বার্লিন মানমন্দিরে গবেষণা। সেখানে কিন্তু পূর্ব থেকে মজুত ছিল গ্রহ নক্ষত্রদের নকসা। গালের তাই কোনো অসুবিধা হলো না। 1846 খ্রীস্টাব্দের এক রাতে ল্যাভেরিয়া আকাশের ঠিক যে জায়গায় গ্রহটির থাকার কথা বলে নির্দেশ করেছিলেন—ঠিক সেই জায়গায় ম্লান আলোর এক চাকতির মত নেপচুনকে খুঁজে পেলেন। রোমের সমুদ্র দেবতার নাম নেপচুন। তাই সদ্যআবিষ্কৃত বলে নাম রাখা হয়েছিল এই গ্রহটি অন্ধকার মহাসমুদ্র সদৃশ মহাকাশে বিচরণ করছে নেপচুন।

এর অল্প পরেই চ্যালিসও দেখা পেয়েছিলেন গ্রহটির। কিন্তু আবিষ্কারের গৌরব চ্যালিস বা ল্যাভেরিয়ে কেউই লাভ করলেন না। ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য সম্মানিত হয়েছিলেন অ্যাডামস এবং আবিষ্কারকের গৌরব অর্জন করেছিলেন "গাল"।

ইলেকট্রনিক প্ল্যান্ট স্টোর

অভিজিৎ সাহা

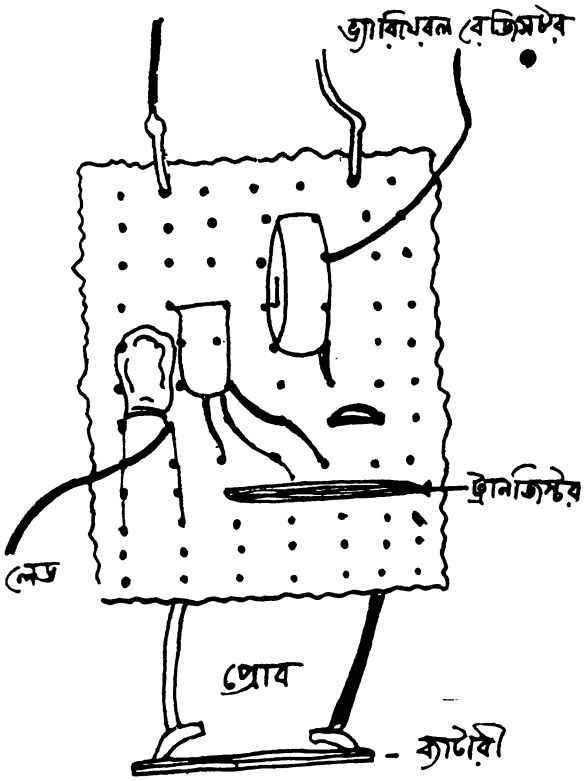

চিত্র - 1

এই ক্ষুদে মজাদার ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে তুমি খুব সহজেই জেনে নিতে পারবে তোমার টবের ফুল গাছে জল চাই কিনা. খরচও কম। এবং অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

এবার তাহলে লেগে পড়া যাক। যে জিনিসগুলো লাগবে :—4.7Ω ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর (ভার্টিকাল স্কেলিটন টাইপ) 4.5 ভোল্ট ব্যাটারী। ট্রানজিসটর টাইপ Be 171A LED (যে কোনো রং)।

দুটুকরো শক্ত 10 সেমি তার চাই প্রোবের জন্য।

20 সেমি ব্ল্যাক টেপ চাই প্রোবকে ঢেকে রাখার জন্য।

20 সেমি ইলেকট্রিক তার। দুটো পিন।

ভেরো বোর্ড 7ট্রাক × 12 গর্ত। জিনিসগুলো তুমি চাঁদনীচকে পেয়ে যাবে।

এবার ছবি দেখে তৈরি করে ফেল।

ভেরো বোর্ডে পার্টসগুলো ভালোভাবে বসাবে।

তৈরি হয়েছে তো ?

এবার পরীক্ষা করার পালা। লম্বা প্রোব মাটিতে ঢুকিয়ে দিতে হবে। LED জ্বলে উঠলে বুঝবে গাছ জল চাইছে। কি হলো ?

LED দপদপ করে নিভে গেল না একেবারে নিভে গেল। তাহলে গাছে জল দিতে হবে না।

যদি এগুলো না হয় তবে বুঝতে হবে কোথাও ভুল আছে।

এবার তাহলে দেখ :—

বোর্ড থেকে তার ব্যাটারীর নেগেটিভ ও পজিটিভ টার্মিনালে ঠিকভাবে যুক্ত হয়েছে কিনা।

যদি ঠিক থাকে তবে বুঝতে হবে ট্রানজিস্টর, কাপাসিটর ডায়োড ও LED খারাপ আছে। এগুলো পাল্টিয়ে তাহলে আবার নূতন করে বসাও।

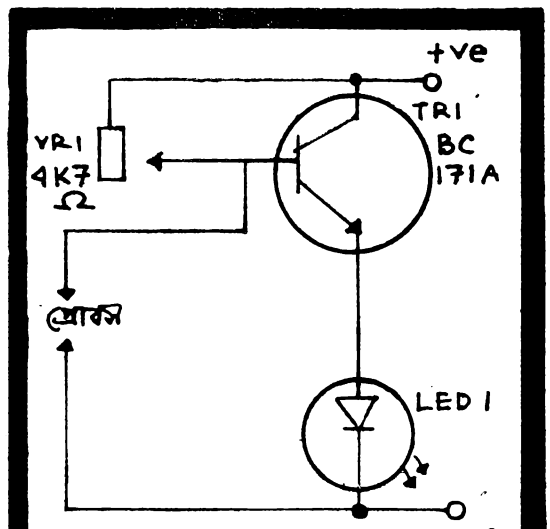

চিত্র-2

প্রযত্নে-অতুল চন্দ্র সাহা, গ্রাম-স্কুলেপাড়া, পোঃ-গঙ্গারামপুর, জেলা-পশ্চিম দিনাজপুর, পিন-733124

পাথর কেটে বই

কার্তিক ঘোষ

আসল গল্পটা মিশর দেশকে নিয়ে হলেও, ফরাসী দেশটার কথা বলতেই হবে একটু। কারণ গল্পের যাঁরা নায়ক তাঁরা প্রায় সববাই ছিলেন ফরাসী দেশের মানুষ।

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগের কথা। তখন ফরাসী দেশের সম্রাট ছিলেন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। বিশ্বজয়ের আকাঙ্খায় তিনি তখন বিভোর। জয়ও করেছেন অনেক দেশ। হঠাৎ নজর পড়ল মিশরের ওপর। তোমরা জানো, মমি আর পিরামিডের দেশ মিশর। সোনা আর পান্নার ছড়াছড়ি সেখানে। সভ্যতার ইতিহাসেও সে দেশের ভূমিকা অগ্রগন্য।

নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনীতে ছিলেন বৌসার্দ। তরুণ এক ইঞ্জিনিয়ার তিনি। ক্যালেণ্ডার পাতার 1799 সালের আগস্ট মাস সেটা। রশীদ নামে একটা গ্রামের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল কালো বেসল্টের কালো একটা পাথরের ওপর।

বৌসার্দ হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

তিনি জানতেন মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের কথা। কিন্তু পাথরের ওপর হিজিবিজি লেখার একটা অক্ষরও পড়তে পারলেন না তিনি। যুদ্ধ শিবিরে ফিরেই কথাটা বলে ফেললেন জেনারেল মেনু। তিনি শুনেই বুঝে নিলেন কালো পাথটার মূল্য। তখন আর দেরী নয়। রশীদ গ্রাম থেকে পাথর খানি তুলে নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন সোজা ফ্রান্সে। একেবারে নিজের বাড়িতে।

কিন্তু সম্রাট নেপোলিয়ান তখন স্বয়ং মিশরে হাজির। তাঁর কানে কথাটা উঠতেই তিনি হুকুম করলেন পাথরখানি নিয়ে আসার। জেনারেল মেনু আর কি করেন! মনের কষ্ট মনে চেপে রেখেই পাথরখানি পৌঁছে দিলেন কায়রোয়।

নেপোলিয়ান পাথরখানি নিজের চোখে দেখেই বুঝে গেলেন ব্যাপারটা। লেখার ছাপ তুলে পাঠিয়ে দিলেন ইউরোপের নানা দেশে। প্যারিস থেকেও তখন লিপি বিশেষজ্ঞরা এসে হাজীর হয়েছেন পাথরটা পড়ে ফেলার জন্যে।

ওদিকে যুদ্ধে হঠাৎ ইংরেজদের কাছে হেরে বসলেন নেপোলিয়ান। বিশ্বজয় আর হল না। উল্টে সন্ধির শর্তে কায়দা করে ইংরেজরা জুড়ে দিল ঐ পাথরটার কথাও। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ফ্রান্সকে দিয়ে দিতে হবে পাথর খানা।

নেপোলিয়ান তখন বুদ্ধি করে পাথরটা ফিরিয়ে দিলেন জেনারেল মেনুকে। মেনু দাবি করলেন পাথরটা আমার ব্যাক্তিগত সম্পত্তি।

ইংরেজরা তো শুনেই আগুন। বলে কি ফরাসীরা? সন্ধির শর্ত মানবে না? বেশ। তাহলে আমরাও দেখছি।

মেনুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো এক গোলন্দাজ বাহিনী। সঙ্গে এক মেজর জেনারেল। শেষপর্যন্ত কেড়ে আনা হলো সেই কালো পথের খানা।

তা মিশরের রশীদ গ্রামের নামটা তখন বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। তবে ইউরোপীয়রা তো রশীদকে উচ্চারণ করে রসেটা বলে। সেই জন্যেই পাথরখানাও রসেটা পাথর নামেই খ্যাত হয়ে পড়ল দেশে-বিদেশে।

কিন্তু পাথরখানা নিয়ে কাড়াকাড়ি করলে কি হবে। পণ্ডিতরা প্রায় সবাই হার মেনে ফিরে গেলেন যে যার দেশে। লেখাগুলো পড়া বুঝি কারো সাধ্য নয়। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে কতবার যে কত চেষ্টা হয়েছে তার ঠিক নেই।

শেষে ফরাসীরাই বুঝি জিতে গেলেন।

জাঁ ফ্রাসোয়াঁ শাপোলিয়ঁ নামে এক পণ্ডিত তখন স্বপ্ন দেখছেন সেই দেশে।

রসেটা পাথরটা যখন আবিষ্কার হয়েছে তখন তো শাপোলিয়ঁর বয়েস মাত্র নয়। মিসরের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে গবেষনার জন্যে ফ্রান্সে তার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটা প্রতিষ্ঠান। নাম, ইজিপশিয়ান ইনস্টিটিউট। তার একজন হর্তাকর্তা ব্যক্তি ফরিয়ের।

মাত্র এগারো বছরের ছেলে শাপোলিয়ঁ, তাঁর কাছেই একদিন শপথ করেছিলেন, দেখবেন, কালো পাথরের বইটা আমি একদিন পড়বই।

কথাটা বোধ হয় শুনে হেসেছিলেন সবাই।

কিন্তু কে জানত শাপোলিয়ঁ বলে একটা ছেলেই একদিন উজ্জ্বল করবে ফরাসীদের মুখ। বেশি নয়, মাত্র আঠারো বছর বয়েসে এক ডজনেরও বেশি ভাষা শিখে এগিয়ে পড়েছিলেন একাই।

তারপর আর একদিনও থামেন নি। লুপ্ত রহস্যের সন্ধানে সঁপে দিয়েছিলেন সারা জীবন। কখনও হতাশায় ক্লান্ত, কখনও নিদ্রাহীন রাত্রি আটকে রাখতে পারে নি শাপোলিয়ঁকে। একটানা তেইশ বছর পরিশ্রম করেছিলেন কঠোর সাধনায়।

শেষেরটা পাথরের পাঠোদ্ধার করেছিলেন তিনি।

তিন রকমের লিপি খোদাই করা আছে তাতে। সবার প্রথমে আছে মিসরের হায়ারোগ্লিফিক লিপি। ছোট ছোট ছবির মত দেখতে। মাঝখানে ডেমোটিক এবং সব শেষে গ্রীক লিপি। খোদাই করা হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব 196 সালে। মিসরের রাজা তখন নিজে একজন গ্রীক। নাম, পঞ্চম টলেমি।

কুড়কুড়ি, তাঁতিশাল, হুগলি।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার 7ম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত থাকতে পারেনি অথচ সফল প্রতিযোগী তাদের সার্টি-ফিকেট ও পুরস্কার 31 জুলাই 1988-এর মধ্যে সংগ্রহ করে নেবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ঐ তারিখের পর—তাদের সার্টিফিকেট ও পুরস্কার ডাকযোগে পাঠানো হবে।

পরিচালক

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

বিঃ দ্রঃ মডেল প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র ও দেবকুমার রায় প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচিত হয়েছে। এদের দুজনকেই মডেলের নির্মাণ ব্যয় ও সার্টিফিকেট নেবার জন্য দপ্তরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সফল উত্তরদাতাদের নাম

জুন '88-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে সার্টিফিকেট পাবে :

1. **সুতপা মাহাত,** প্রযত্নে, রাধাগোবিন্দ মাহাত পোস্ট—ঝাড়গ্রাম জেলা—মেদিনীপুর 721507।

2. **সোনালী পিলসিমা,** প্রযত্নে, বৃন্দাবন পিলসিমা 54, গৌরাঙ্গতলা পোস্ট—খাগড়া জেলা—মুর্শিদাবাদ।

3, **সৌরভ রায়** প্রযত্নে, এস. কে রায় পোস্ট—মেদিনীপুর জেলা—মেদিনীপুর।

4. **উদয়ন মজুমদার** 41/34. জি. পি রোড হালিসহর. খাসবাটী পোস্ট—হাজিনগর জেলা - উত্তর 24-পরগনা।

5. **অলোক কুমার চক্রবর্তী** প্রযত্নে, জি. সি. চক্রবর্তী জাঙ্গালপাড়া পোস্ট—সিউড়ি জেলা—বীরভূম।

6. **পিনাকী রঞ্জন মিশ্র** প্রযত্নে, গৌরহরি মিশ্র গ্রাম+পোস্ট—জায়গীর-চক্ জেলা—মেদিনীপুর 721644।

7. **সব্যসাচী সরকার** প্রযত্নে, সুবলচন্দ্র সরকার নলুয়াপাড়া, কৃষ্ণনগর জেলা—নদীয়া।

জুন '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড I-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কার পাবে :

1 **প্রদীপ দাস** প্রযত্নে, করুণাময় দাস গ্রাম—উটপাথর পোস্ট—নিমপুরা জেলা—মেদিনীপুর।

2. **সুলতা বসাক** প্রযত্নে, লক্ষ্মীনারায়ণ বসাক 10, রবীন্দ্রপল্লী, কৃষ্ণনগর সুশীল জ্যোতি অ্যাভেনিউ পোস্ট—প্রফুল্লকানন কলকাতা—700059।

3. **গার্গী চ্যাটার্জী** প্রযত্নে, বাসন্তী চ্যাটার্জী গ্রাম—কাছারিপাড়া পোস্ট—বসিরহাট জেলা—24-পরগনা (উঃ) 743411।

জুন '৪৪-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড I-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

হাওড়া ঃ পার্থসারথি কুণ্ডু, **বর্ধমান ঃ** তরুণ তপন গরাই, **বাঁকুড়া ঃ** রমা ব্যানার্জী, সুপ্তজিৎ সেনগুপ্ত, রুপাঞ্জন সাহা।

জুন '৪৪-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনস্টেট গ্রেড III-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কার পাবে ঃ

1. **অনুপম সরকার** কাঁটাপুকুর পোস্ট—মগরা জেলা—হুগলী 712148।
2. **মিনতি ঘোষ** গ্রাম—জয়রামপুর (এস. টি রোড) পোস্ট—শুকদেব পুর, জেলা—24-পরগনা 743503
3. **সিদ্ধার্থ দাস** প্রযত্নে, প্যারীমোহন দাস গুসকরা, বর্ধমান—713128।

জুন '88-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড III-এর উত্তর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

হাওড়া ঃ অভিজিৎ খাঁড়া,

হুগলী ঃ উৎপল শেঠ,

24-পরগনা ঃ দীনেশ চন্দ্র সাহা,

মেদিনীপুর ঃ সুব্রতেশ রায়, দিলীপ দাস.

নদীয়া ঃ শিপ্রা পাল।

জুন '৪৪-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II উত্তর প্রদান আশানুরূপ না হওয়ায় কোন নাম প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

প্রতিযোগীদের প্রতি

কুপন সহ উত্তরপত্রগুলি আলাদা আলাদা খামে—এবং খামের উপরে প্রতিযোগিতার নাম উল্লেখ করে পাঠাতে হবে।

পরিচালক ঃ কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড—I II III-এর উপহার

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

আগস্ট '88 সংখ্যার ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড-1 **অমরনাথ রায়ের সায়েন্স এক্সপেরিমেণ্টস**

গ্রেড-2 **সমরজিৎ করের পরমাণু গবেষণায় ভারত**

গ্রেড-3 **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীল মানুষের কাহিনী**

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—1/2/3 এবং আই কিউ টেটেস্ট উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি.....

.....

বাড়ির ঠিকানা.....

.....

বয়স..... শ্রেণী .....

বিদ্যালয়ের নাম .....

.....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এর উত্তর পাঠালাম।

সায়েন্স এক্সপেরিমেণ্ট

লাল কালি-নীল কালি

অপরাজিত বসু

চালের কাঁকড় হাতে বাছাই করা যায়। চোখে দেখে চাল আর কাঁকড়কে আলাদা করে চেনা যায় বলেই তা সম্ভব। কিন্তু চিনির সঙ্গে নুন মিশে গেলে তো হাত-বাছাই চলবে না। তাহলে উপায়? মিশ্রণটিকে জলে গুলে নিয়ে কেলাস ফেললে চিনি ও নুন আগে পরে কেলাসিত হবে এর নাম আংশিক কেলাসিভবন।

এবার যদি বলি যে লাল কালির মধ্যে নীল কালি পড়েছে, এদের আলাদা করতে হবে, অথবা চা-এর লিকারের সঙ্গে ইনস্ট্যান্ট কফি মিশে গেছে-এদের আলাদা করতে হবে। পারবে কি? দেখ কিভাবে আমরা এদের আলাদা করি।

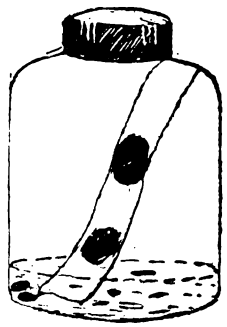

কি কি লাগবে? একটা বড় হরলিক্সের শিশি আর ব্লটিং বা ফিলটার কাগজ। এ দিয়ে তুমি লাল কালি ও নীল কালিকে দু'দিকে ঠেলে দেবে। ভাবছো, ফিলটার কাগজে পরিস্রাবণ করবে? তাতে তো আলাদা হবে না। লাল কালির দ্রবণ ও নীল কালির দ্রবণ—দু'জনেই একসঙ্গে ফিলটার কাগজের মধ্যে দিয়ে গলে যাবে!

হরলিক্সের শিশিকে ভাল করে পরিষ্কার করে নাও। তারপর তার মধ্যে লাল কালি-নীল কালির মিশ্রণটার অল্প একটু ঢাল। দেখবে, কালির তলানি যেন খুব বেশি না হয়, আধ ইঞ্চি হলেই চলবে। ফিলটার বা ব্লটিং কাগজটাকে লম্বাটে ফালির আকারে কাট, লম্বায় ইঞ্চি আটেক ও চওড়ায় ইঞ্চি দেড়েক। কাগজটাকে এবার সাবধানে কালির মধ্যে এমনভাবে ডুবিয়ে দাও যেন কাগজের প্রান্তের আধ ইঞ্চি কালিতে ডুবে থাকে, বাকিটা শিশির ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। শিশির মুখটা বন্ধ করে দাও। শিশিটাকে নাড়া-চাড়া না করে এক জায়গায় স্থির করে রেখে দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখবে যে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে কাগজ বেয়ে উপরে উঠছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে দেখবে যে চোঁয়ানো জল প্রায় কাগজের মাথা ছুঁয়ে ফেলেছে এবং কাগজের নিচের দিকে এক জায়গায় নীল ছোপ ধরেছে অন্য এক জায়গায় লাল ছোপ ধরেছে। ঐ লাল ও নীল রঙের ছোপ দু'টি লাল ও নীল কালি। তারা কেমন আলাদা হয়ে গেছে। কাগজের ছোপ ধরা অংশ দু'টিকে আলাদাভাবে কেটে নিয়ে জলে আলাদাভাবে গুললে তুমি লাল কালি ও নীল কালিকে আলাদা-আলাদা পাবে। তবে যতটা কালি মিশে গিয়েছিল, সবটুকুকে আলাদা করা যাবে না। একই পদ্ধতিতে তুমি চা ও কফিকে আলাদা করতে পারো।

বৈজ্ঞানিকরা এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন "পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি।" একটি দ্রবণে একাধিক পদার্থের অণু দ্রবীভূত থাকলে তাদের কাগজ চুঁইয়ে ওঠার ক্ষমতার তারতম্য দেখা যায়; এই ধর্মকে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে ব্যবহার করা হয়।

বিজ্ঞানের পঞ্চাশটি অভিনব খেলা নিয়ে লেখা আশ্চর্য বই!

অমরনাথ রায়ের

সায়েন্স এক্সপেরিমেণ্টস্ ১০·০০

যা তোমরা স্কুলের ল্যাবরোটারীতে বা বাড়িতে বসেই পরীক্ষা করতে পারো

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড কল-9

বিজ্ঞান সংবাদ

বর্ণময় স্বচ্ছ আলোক চিত্রের প্রদর্শনী

বিড়লা ইণ্ডাসট্রিয়াল ও টেকনলজিক্যাল মিউজিয়ামের সহযোগিতায় ইণ্ডিয়ান কালার ট্রান্সপ্যারেন্সী সংস্থা আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিল গত 25 এবং 26 জুন। উভয় দিনের অনুষ্ঠানে সমর বাগচি, তারক মোহন দাস, নারায়ণ সান্যাল, সীমা সেন প্রমুখ বিশিষ্ঠ অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশ দিবস

আসাম বিজ্ঞান সমিতির ঢেকিয়াজুলি শাখার উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ উপলক্ষে ঢেকিয়াজুলি টাউনে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র বর দেবের পৌরহিত্যে "পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য" শীর্ষক আলোচনা চক্রটি ছিল একটি আকর্ষণীয় এবং অন্যতম কার্যসূচী। সেই আলোচনার বিশিষ্ট বক্তা অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ভূঞা এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারী গন পরিবেশের সমতাতে যাতে কোনো রকমের বাধা বিঘ্ন না ঘটে তার প্রতি সতর্ক হবার জন্য গণ আন্দোলন গড়ে তোলবার জন্য গুরুত্ব প্রদান করেন।

এই উপলক্ষে অন্যান্য কার্য্যসূচীর শেষে সম্পাদক শ্রী ধ্রুব নাথের নেতৃত্বে স্থানীয় পৌরসভার সহযোগিতায় ঢেকিয়া জুলি হাইস্কুল এবং নগর বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এবং রাস্তার পাশের জায়গা গুলো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়।

ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

বরিবার, 29 মে, 88, সকাল 9টায় ছাত্র সম্মিলনী আয়োজিত ক্যুইজ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কৃত হন—অরিজিৎ মল্লিক বিজয় মল্লিক, শুভ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও অনুপম বন্দ্যোধ্যায় প্রমুখ।

কুইজের পর পশ্চিম বঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সহায়তায় একটি আলোক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল 'পরিবেশ ও মানুষ'। শহরের বহু মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞান ক্লাব সংবাদ

গত 12ই জুন '88 রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে 'বিশ্ব পরিবেশ সপ্তাহ' উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ সমস্যার উপর একটি বসে আঁকো ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ল। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল উত্তর কলকাতার অ্যাসেম্বলী ফর সাইন্স লাভার্স। সংস্থার ডিরেক্টর অধ্যাপক ডঃ পাথসারথি রায় অনুষ্ঠানের সূচনা করতে গিয়ে জানালেন এধরণের প্রতিযোগিতা তাদের সংস্থায় এই প্রথম। শ্রীরায় আরও জানান তাদের সংস্থা পূর্ব ভারতের বিজ্ঞান ক্লাব গুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের লক্ষ্যে গতবার একটি পূর্বভারতীয় বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলনের আয়োজন করেছিল এবারও তারা এধরণের একটি সম্মেলন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

* * *

গত 5ই জুন '88 বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গড়িয়ার বিবেকানন্দ জুনিয়র হাইস্কুলে একটি ক্যুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল গড়িয়ার 'সবুজের অভিযান' নামে একটি নবগঠিত বিজ্ঞান ক্লাব।

বুদ্ধি ও মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষা

জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত Intelligence and Science Talent Test পরীক্ষা শুরু হবে আগামী 18 সেপ্টেম্বর 1988। ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীগন যোগাযোগ করুন :

মনোজ দত্ত, যুগ্ম সম্পাদক
জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ
18B/c টেমার লেন, কল 9

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত

নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ॥

বিষয় : বিজ্ঞান ও বিশ্বশান্তি

সফল প্রতিযোগীদের সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ উপহার প্রদান করা হবে।

যোগদানের শেষ তারিখ 2রা আগষ্ট 1988

ঠিকানা : P-23 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-6

বুদ্ধি ও মেধা চর্চার জন্য

অমরনাথ রায় ॥ **নলেজ ক্যুইজ** ১০
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **গণিত ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **সায়েন্স ক্যুইজ** ১০
অলক চক্রবর্তী ॥ **ফিজিক্স ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **কেমিস্ট্রী ক্যুইজ** ১০

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার ॥ কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ লুপ্তধন ৮
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ মেঘনাদ ১০
অদ্রীশ বর্ধন ॥ কিশোর সায়েন্স ফিকশন ১৫
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য ৮

কারিগরী বিদ্যার প্রথম পাঠ
সহজ সরল ব্যাখ্যাসহ প্রায় অর্দ্ধশত মডেলের সচিত্র নির্মাণ প্রণালী
জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত
নিজে নিজে কর ১০

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ **বিচিত্র বিজ্ঞান** ৮
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **যুক্তিতর্ক হেঁয়ালি** ৮
বিমান বসু ॥ **গ্রহ পরিচয়** ১২
পার্থসারথি চক্রবর্তী
মাটি থেকে আকাশে ১০
অমরনাথ রায় ॥ **সংখ্যা নিয়ে খেলা** ৮
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানেরআকস্মিকআবিষ্কার ৮
অমরনাথ রায়
জ্ঞানবিজ্ঞানের মজার খেলা ১০
সাধন দাসগুপ্ত ॥ **আলো আরও আলো** ১৫
সাধন দাসগুপ্ত ॥ **রোমাঞ্চকর রসায়ণ** ১২
সাধন দাসগুপ্ত ॥ **ভাষা গণিত** ২০
সিদ্ধার্থ ঘোষ
অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ১৫
স্যাম লয়েড ও লুইস ক্যারোলের ধাঁধা ১০

কিশোর রচনাবলী

জগদীশচন্দ্র বসু ॥ কিশোর রচনা সমগ্র ২৫
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
কিশোর রচনা সমগ্র ৩০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥
শার্লক হোমস্ কিশোর সমগ্র ২৫
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ রোমাঞ্চকর ২৫
মেঘনাদ সাহা ॥ কিশোর রচনা সঙ্কলন ১২

ভ্রমণ ও অভিযান

সুনির্মল বসু ॥ রোমাঞ্চের দেশে ৬
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
সুন্দরবনে সাত বৎসর ১০
ধীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী ॥ দুরন্ত যাত্রী ৮
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ গঙ্গা যমুনা ৮
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥
আমাজনের অরণ্যে ৮
সুনির্মল রায় ॥ চাঁদের পাড়ি ৮
দেবব্রত চক্রবর্তী ॥ চক্রতীর্থের চমক ১০

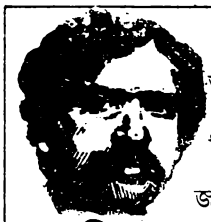

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গল্প প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও চিঠিপত্রের মূল্যবান সঙ্কলন
জগদীশচন্দ্র বসু
কিশোর রচনা সমগ্র ২৫

কিশোর ক্লাসিকস্

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ **তেপান্তর** ২০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **কিশোর অপু** ২৫
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপন পাঠশালা ১০
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়॥ **ছোটদের কাজল** ১০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদা বিচিত্রা** ২৫
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার অভিযান ২৫
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ **বাঙলার ডাকাত** ২৮
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপুর ছেলেবেলা ১০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের অপরাজিত ১০

R/No 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN REGD NO WBEC 316 7TH YR VOL 10

ক্লাস অ্যানুয়ালে বেশী নম্বরের জন্য

তারকমোহন দাস ও সীমা সেন	লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	সায়েন্স ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী	ফিজিক্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য	গণিত ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	নলেজ ক্যুইজ
অমরনাথ রায়	কেমিস্ট্রী ক্যুইজ

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ । প্রতিটি ১৫ টাকা

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২ দাম ঃ 4·50 টাকা।